ছোটদের আসর

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষ্যে

বিশেষ রচনা

ছড়া

কৃষ্ণ ধর, কাজী মুর্শিদুল আরেফিন, যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার

গল্পকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মঞ্জিল সেন

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

শিশির কুমার মজুমদারের

দিনাঙ্গারার রহস্য

এ ছাড়া নিয়মিত কলমে

অমিতাভ চৌধুরী ঃ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ বরুণ মজুমদার

সেই সাথে

নারায়ণ দেবনাথের

ছোটদের আসর মাতানো ডানপিটে খাঁদু আর কেমিক্যাল

দাদুও হাজির

আর

রূপকথা, খেলাধূলা, কত অজানারে, দেয়ানেয়া এবং প্রতিযোগীতা,

হাসির হুট্টমেলা, শব্দ জব্দ

প্রতি ইংরাজি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ হয়।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
তুমি আজ কি জিনিস তৈরি করছো, দাদু?
একটা নতুন ধরনের বুজবুজি পানীয়। ইচ্ছে করলে তুই এটা প্রথম চেখে দেখতে পারিস।
কিন্তু সাবধান, বেশী দেবার প্রয়োজন নেই! এটা এতো বুজবুজে যে বুদবুদের ফেনায় উপচে পড়বে!
বুজ বুজ
তোর মুখ দেখে আমি বলতে পারি যে, এটার স্বাদ বেশ ভালো!
দারুণ!
সত্যি দাদু, এটা চমৎকার! এখন আমি খেলতে যাচ্ছি, কিন্তু তেষ্টা পেলে খাওয়ার জন্যে সঙ্গে আরো কিছু নিয়ে যাচ্ছি।
আমি এই জিনিসটা দিয়ে বেশ মজাও করতে পারি!
হাঃ হাঃ! দারুণ মজা!
বুজবুজ!
এই যে, পুসি! তুইও এটা একটু চেখে দেখ!
হাঃ হাঃ!
বুজবুজ!

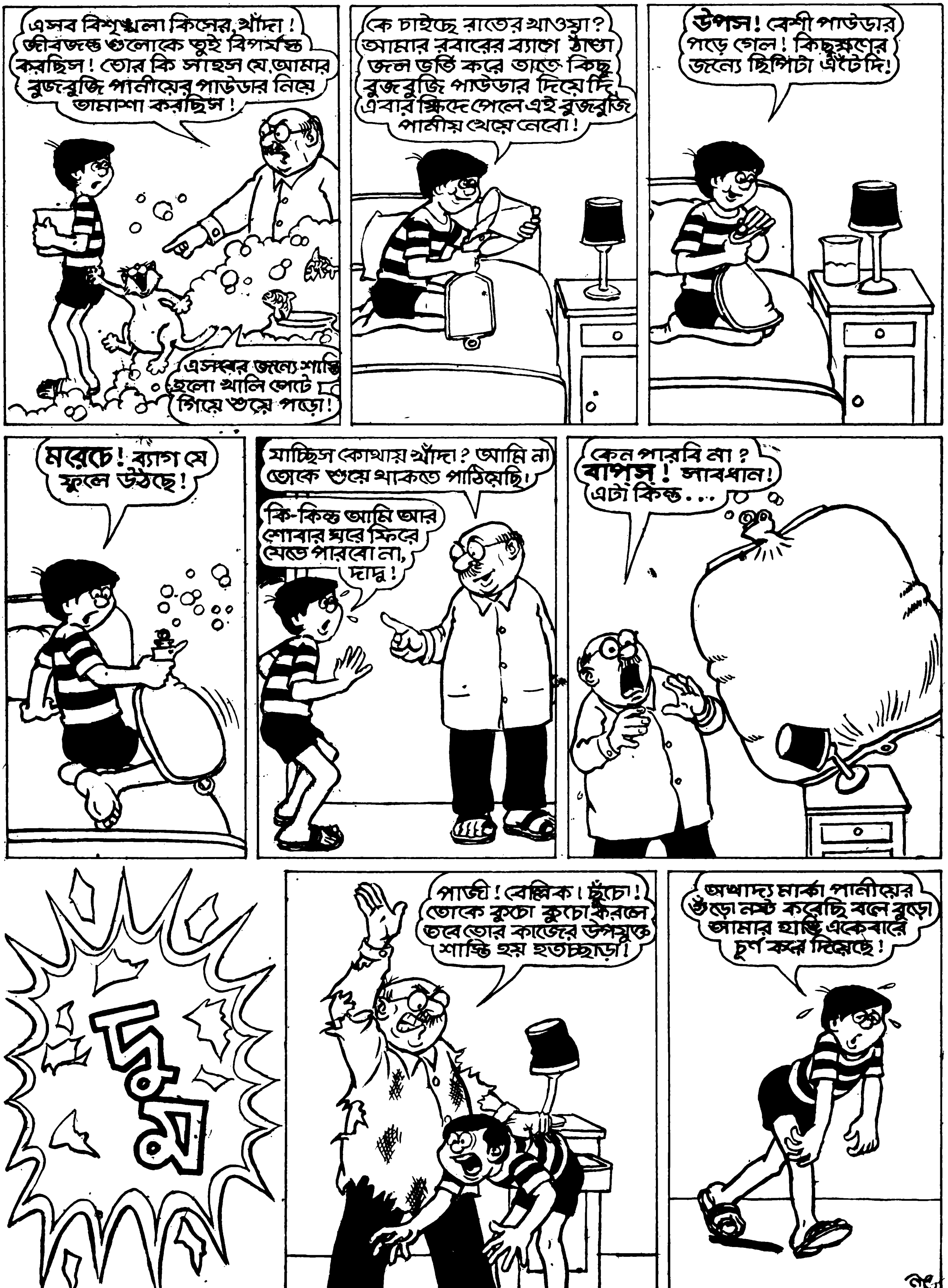
এসব বিশৃঙ্খলা কিসের খাঁদা! জীবজন্তু গুলোকে তুই বিপর্যস্ত করছিস! তোর কি সাহস যে আমার বুজবুজি পানীয়ের পাউডার নিয়ে তামাশা করছিস!
এসবের জন্যে শাস্তি হলো খালি পেটে গিয়ে শুয়ে পড়ো!
কে চাইছে রাতের খাওয়া? আমার রবারের ব্যাগে ঠাণ্ডা জল ভর্তি করে তাতে কিছু বুজবুজি পাউডার দিয়ে দি, এবার খিদে পেলে এই বুজবুজি পানীয় খেয়ে নেবো!
উপস! বেশী পাউডার পড়ে গেল! কিছুক্ষণের জন্যে ছিপিটা এঁটে দি!
মরেছে! ব্যাগ যে ফুলে উঠছে!
যাচ্ছিস কোথায় খাঁদা? আমি না তোকে শুয়ে থাকতে পাঠিয়েছি।
কি-কিন্তু আমি আর শোবার ঘরে ফিরে যেতে পারবো না, দাদু!
কেন পারবি না?
বাপস! সাবধান! এটা কিন্তু...
দুম
পাজী! বেল্লিক! ছুঁচো! তোকে কুচো কুচো করলে তবে তোর কাজের উপযুক্ত শাস্তি হয় হতচ্ছাড়া!
অখাদ্য মার্কা পানীয়ের গুঁড়ো নষ্ট করেছি বলে বুড়ো আমার হাড্ডি একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে!

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু
— নারায়ণ দেবনাথ ১-২
কেমন জব্দ (ছড়া)—মুস্তাফা নাশাদ ৪
পাহাড়ী কাঠুরিয়া (রূপকথা)—শুভ্রা রায় ৫
রাণী পেনিলপির দ্বিতীয় স্বয়ম্ভর সভা (গল্প)
—বিমলকান্তি দাস ৯
দুঃসাহসী মানুষ ঈগল (সত্য ঘটনা)
—শ্যামলী বসু ১১
সোনার ঘুড়ি (ছড়া)—বিমলেন্দু চক্রবর্তী ১২
শামুকের বিয়ে (ছড়া)—নির্যাস বসু ১৩
আজব কথা আজব ভাবনা—অমিতাভ চৌধুরী ১৭
ভূতের দেশে ভূতনাথ—বিদ্যুৎ মল্লিক
রহস্য বাংলো—সঞ্জীব বসু ২১
হাসির হট্টমেলা—রসময় ২৩
একলব্য (চিত্রে কাহিনী)—বিদ্যা অশোক ২৪-২৫
কাঁচা ওজন (গল্প)—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২৯
দিনাঙ্গনার রহস্য (ধারাবাহিক উপন্যাস)
—শিশির কুমার মজুমদার ৩৩
মজার খবর—বরুণ মজুমদার ৪০
শিল্পী যামিনী রায়—দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় ৪২
ম্যাজিকের মজা—যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার ৪৪
খেল ছড়া—অর্জুন সোম, সুরজিৎ মজুমার…৪৬-৪৭

॥ এবং সব নিয়মিত বিভাগ ॥

০ অনিবার্য কারণ বশতঃ এ সংখ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বালির ওপর পোল প্রকাশ করা গেল না।

ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমাদের সুখবর দিয়ে লিখেছিলাম—বসে আঁকো আর গল্প প্রতিযোগিতা হবে। কিন্তু ক্ষুদে আঁকিয়েরা শুনে দুঃখ পাবে এখুনি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হচ্ছে না।

গল্প প্রতিযোগিতা শেষ হলে তোমাদের জন্য প্রবেশ পত্র ও তারিখ জানাব। তবে সেটা হতে হতে পুজো কাছে এসে পড়বে।

সুতরাং একদম মন খারাপ নয়। আঁকা প্র্যাকটিশ করে যাও! আর হ্যাঁ, পারলে গল্প লেখো কি খুশী তো?

দেবী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনায় ও শিল্প নির্দেশনায়—বেবী মজুমদার, শুভ্রা রায়

প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন সেলস কনসার্ন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক দীপ্তি প্রিন্টিং ১৩ এম, আরিফ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ হইতে মুদ্রিত।

কেমন জব্দ ?

মুস্তাফা নাশাদ

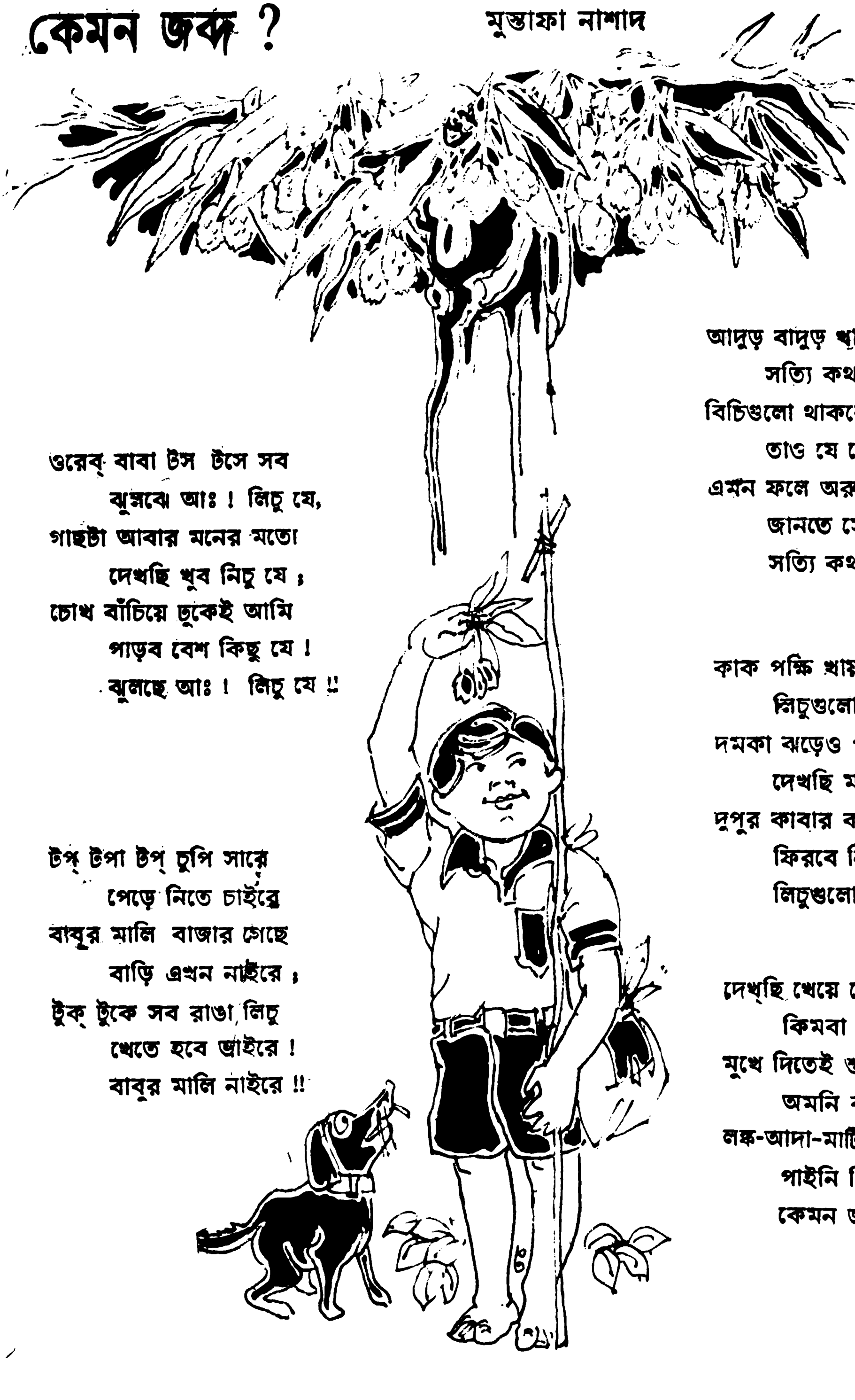

ওরেব্ বাবা টস টসে সব
ঝুলছে আঃ ! লিচু যে,
গাছটা আবার মনের মতো
দেখছি খুব নিচু যে ;
চোখ বাঁচিয়ে ঢুকেই আমি
পাড়ব বেশ কিছু যে !
ঝুলছে আঃ ! লিচু যে !!

টপ্ টপা টপ্ চুপি সারে
পেড়ে নিতে চাইরে
বাবুর মালি বাজার গেছে
বাড়ি এখন নাইরে ;
টুক্ টুকে সব রাঙা লিচু
খেতে হবে ভাইরে !
বাবুর মালি নাইরে !!

আদুড় বাদুড় খায়না কেন ?
সত্যি কথা তাইতো !
বিচিগুলো থাকবে পড়ে—
তাও যে দেখি নাই তো ।
এমন ফলে অরুচি কার ?
জানতে সেটাও চাইতো ।
সত্যি কথা তাই তো !

কাক পক্ষি খায় না দেখি
লিচুগুলো টক্ কী ?
দমকা ঝড়েও পড়ছে না তো
দেখছি মহা ঝক্কি ।
দুপুর কাবার করে বাজার—
ফিরবে নিয়ে হক্ কী ?
লিচুগুলো টক্ কী ?

দেখছি খেয়ে গোটা চারেক
কিমবা গোটা পাঁচ রে,
মুখে দিতেই শুরু হলো
অমনি বাঁদর নাচ রে ;
লঙ্ক-আদা-মাটির লিচু
পাইনি কিছুই আঁচ রে ।
কেমন জব্দ ? নাচ রে !!

পাহাড়ী কাঠুরিয়া

শুভ্রা রায়

সিকিমের এক গ্রাম। পাহাড়ী অঞ্চল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বুনো লতার ঝোপ। অর্কিডের ঝাড়। সবুজ পাতার বাহার। অর্কিডের ঝাড় আর রঙীন পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে জংলী ফুল। সেই সব ফুলের রঙ গোলাপী, বেগুনী, হলুদ, লাল, নীল, সাদা। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় রঙীন প্রজাপতির দল।

গ্রামের নীল পাহাড়ের ওপর কাঠুরের বাড়ী। নাম তার বংশীলাল। কাঠেরই বাড়ী। গাছপালা আর ফুলের মেলায় যেন একটা ছোট্ট মন্দির। কাঠুরে নিজের হাতে তৈরী করেছে। বাটালীর ওপর হাতুড়ী ঠুকে ঠুকে বানিয়েছে সুন্দর সব আলপনা। যাকে বলে কারুশিল্প।

বংশীলালের কিন্তু বউ নেই। সে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়। বউ যেত তার সাথে। পাইন বনের ভেতর ছিল সাপেদের আড্ডা। একদিন কাঠুরে কাটছিল কাঠ। মাটি থেকে কুড়িয়ে জড়ো করছিল বউটি।

হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলে 'কুটুস'। কি যেন কামড়াল! হয়তো কাঠ পিঁপড়ে। এ-নিয়ে গা করে নি সে। এক মনে কুড়িয়ে চলেছে। একটু পরেই শুরু হয় যন্ত্রণা।

—ওগো আমার কি যেন হয়েছে। শীগ্‌গিরি নেমে এসো—।

কথা শেষ করতে পারল না। নেতিয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে।

কাঠুরে গাছ থেকে নেমে আসে। কেমন নীল হয়ে গেছে বউএর শরীর। কোনো কথাই মুখে নেই। চোখ বোজান। কাঠুরে হতচকিত। হাঁটু গেড়ে বসে নিঃশব্দ বউটির পাশে।

মুখটা বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কি হয়েছে! বুঝতে পারেনি কাঠুরে। মজবুত কাঁধের ওপর দেহটিকে তুলে নিয়ে বংশী গেল বদ্যি বাড়ী।

—বুঝলে বংশী, তোমার বউকে লতায় কেটেছে। তারে কথা বলানোর সাধ্যি আমার নেই গো। সবি ভগবানের হাতে!

বউকে ফের কাঁধে নিয়ে পথ চলে সে। সন্ধে হয়ে গেছে। মা-বাবা ফেরেনি। সদরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল চোমংলাল, কাঠুরের বড় ছেলে। আর ছোট ছেলে সোমংলাল, ঘরের ভেতরে বসে বাজনা বাজিয়ে গাইছিল গান।

এর মধ্যে বাবা এল। মা কাঁধে। মরে গেছে। চীৎকার করে সে কি কান্না চোমঙের। সোমং কিন্তু কাঁদেনি। মার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বাজিয়ে শোনাল। বাজাল তার মায়ের প্রিয় সুরটি। এক সময় পাহাড়ী প্রতিবেশীরা এসে কাঠুরে বউকে নিয়ে যায়। কলার ভেলায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেয় টোংরি নদীর স্রোতে।

তারপর কেটে গেছে দিন, মাস, বছর। বংশীলাল কাঠ কাটে। কাঠ কুড়োয় চোমং। কিন্তু চোমঙের মুখে কোনো কথা নেই। মা মরে যাবার পর থেকে সে বড্ড গম্ভীর হয়ে গেছে।

হ্যাঁ।

না।

যাই।

আসছি।

চল।

এই পাঁচটি শব্দ ছাড়া সে কিচ্ছু বলে না। ইচ্ছে করলে বলতে পারত। ইচ্ছে করেই বলে না।

সোমং। সে ছোট্টটি। বাবা আর দাদার জন্য কাঠ জ্বেলে রাঁধে। মেটে হাঁড়িতে চড়িয়ে দেয় ভাত। ভাত ফোটার ফাঁকে সে এক চক্কর দৌড়ে আসে। দৌড়য় পাহাড়ের কোলে। ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে পড়ে। তবু প্রজাপতি ধরতে পারে না।

গুলতি ছুঁড়ে মারে বক কিংবা ডাহুক। জলার ধার থেকে শিকার ধরে ফেরে বাসায়। ভাত নামিয়ে পোড়ায় মাংস, ব্যস। তার কাজ সারা। এরপর জানালায় বসে বাজায় বেহালাটি। চমৎকার সুর বাজে তার হাতে। শুনে পাখিরা এসে ভিড় করে। দাওয়ায়। কিচির মিচির থামিয়ে শোনে সোমঙের বাজনা।

এর মধ্যে গাছ থেকে পা ফসকে পড়ে পা ভাঙল বংশীর। ভাঙা পা নিয়ে সে কি বেরোতে পারে? তাই চোমংকে একা বেরোতে হয় বনে। হাতে কুঠার, জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটে। তার কাঠ কাটার শব্দে গুহায় সর্দার ভালুকের ঘুম গেল ভেঙে।

—কার এমন সাহস! আমার কাঁচা ঘুম ভাঙায়?

গুহা থেকে বেরিয়ে ভালুক তেড়ে আসে। ব্যাজার মুখে চোমং। কালো-লোমশ ভালুককে দেখে ভয়ে আধখানা। 'ঘটাং'। শব্দে কুঠার তার হাত থেকে খসে পড়ে তলায়।

'গরর্! গরর্! নিচে নেমে আয় খ্যাঁদা ছেলে। দেখি তোর বুকের শিলখানা' বলে ভালুক। ভয়ে ভয়ে নেমে আসে চোমং।

এবার বন্য জানোয়ারটি চোমংকে কষে লাগায় কানমলা, পেটে ঘুঁসি, পেছন থেকে রাম ধাক্কা। টাল সামলানর উপায় নেই। কাঠুরে ছেলে চিতপটাং।

ফিক্ ফিক্ ফিক্। ফোক্ ফোক্ ফোক্।

হাসে ভালুক।

'টিংটিঙে বোবা ছেলে কোথাকার। যা, উঠে বাড়ীর পথ দেখ্। এই আমি ঘুমোতে চল্লুম। বিরক্ত করবি তো কুড়ুল কেড়ে নেব। গোঙাৎ' বলে মুখ ভেঙ্চে গুহায় ঢোকে সে। কাঠুরে ছেলেও ধুলোটুলো ঝেড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে চল্ল নীল পাহাড়ের দিকে।

'কি হয়েছে!' অনেক অনেক বার জিজ্ঞেস করে সোমং। কিন্তু গোমরা দাদাটি কিছুতেই মুখ খোলে না।

'যাই আমিই গিয়ে দেখি। তুই আজ রান্না

করিস, কেমন। ব্যাপার যা হোক, মিট্‌মাট করেই ফিরব।' বলে পরদিন সাত সকালে উঠে সোমং বেরোয়। এক কাঁধে কুঠার। আরেক কাঁধে ঝোলান বাজনা।

গুহার কাছাকাছি বন। বনের ভেতর গিয়ে সে গাছের গুঁড়ি খুঁজে বের করে। কুঠার মাটিতে রেখে গুঁড়ির ওপর বসে সোমং। টুং-টাং, টুং-টাং। মিষ্টি গানের সুর। সুরের তালে পা ফেলে নাচতে থাকে বনের পাখিরা। ঝোপের আবছা সরিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরোয় বুনো খরগোশের দল।

চমৎকার সুর। সাথে নাচের শব্দ। সর্দার ভালুকের কাঁচা ঘুম ফের যায় ভেঙে। গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেই কালো জানোয়ার।

—হতচ্ছাড়া! কাঠুরের পাজী ছেলে। আজ তোর সব কটা দাঁত খুলে নেব।

তেড়ে আসে রেগে। সোমং কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। এক মনে বাজিয়ে চলে সুর। খামচে খুমচে দেবে ভেবেও শেষ অব্দি পারল না ভালুক। তালে তালে তার পা জোড়াও উঠল নেচে। তা-তা, থই-থই চলে কিছুক্ষণ। উবে যায় সবটুকু রাগ।

'ওগো সুরেলা ছেলে, আমায় যন্ত্রটা বাজাতে দেবে একটু!' ভালুকের কথায় খুব খুশী সোমং। লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'বস এই গুঁড়ির ওপর। নাও, বাজাও দেখি।'

ভালুকের হাতের চেটো, মানে থাবা মোটা, আঙুল ভোঁতা, ভাঙা নখের ডগা, তারে তারে সুর পরাতে গোটা কতক কং কড়াং, কং কড়াং আওয়াজ তোলে সে।

সোমং—তোমার ধুমসো চেটোর দ্বারা, কখনো সুর হয়? আমার কথা শোনো। চেটো পাতলা করতে হবে। তাহলে বাড়বে আঙুল। নখও হবে ছুঁচালো। তখন মনের সুখে বাজাতে পারবে।

ভালুক—তোমার যদি চেটো পাতলা করার উপায় জানা থাকে তো আমায় সহযোগিতা করবে?

সোমং—উপায় এক 'কল্' আছে বটে। চল দেখি কি করা যায়।

কাছেই ছিল চেরা এক ওক্ গাছ। সোমং কুঠার চেরা ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল। বল্ল—'এই ফোঁকরে চেটো দুটো রাখো।' ভালুক রাখল। সঙ্গে সঙ্গে কুঠারটা টেনে বের করে ফেলে সোমং।

—ওহে সুরেলা ছেলে, আমার সুর বাজিয়ে কাজ নেই। পাতলা চেটোর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে কাঠের ফাঁক থেকে মুক্ত কর—

কুঠার নিয়ে কাঠ কাটতে চলে সোমং। দূর থেকে ভেসে আসে তার কন্ঠস্বর, "দুষ্টুমি কর না। তোমার চেটো পাতলা হতে হতে আমি কাঠ কেটে নি। তারপর বসে বসে তোমাকে শিখিয়ে দেব অদ্ভুত সব সুর। বুঝলে ভালুক মা—মা।"

"রাগের ফল"

সৌমিত্র মুখার্জী

রেগে আগুন চণ্ডী খুড়ো
ছিঁড়ছে নিজের দাড়ি,
গিন্নি এসে মাথায় তাহার
চাপায় ভাতের হাঁড়ি।
খুড়ো যতই চেঁচিয়ে ওঠে—
খুড়ীর মুখে হাসি ফোটে—
চটবে যত ভাতটা তত
ফুটবে তাড়াতাড়ি।

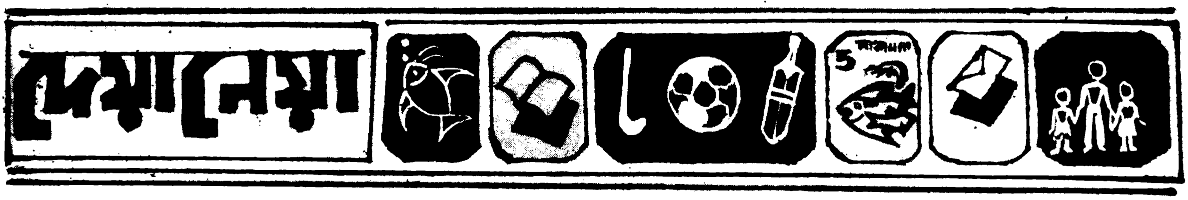

পাতা সংগ্রাহক

আমাকে যদি প্রকৃতি প্রেমী বল রাগ করব না। কারণ কম বেশী আমরা সব মানুষই প্রকৃতিকে ভালবাসি। তুমি কি না করবে।

গাছের সবুজ পাতা শুধু চোখের দৃষ্টি সতেজ করে না রোগ সারাতে অনেক সহযোগিতাও করে থাকে। বাসক পাতা সর্দি কাশিতে কেমন উপকারী জানো নিশ্চয়ই।

আমি বিভিন্ন পাতা সংগ্রহ করি। কিন্তু সব পাতার গুণ জানি না। তাই আমার ইচ্ছে তোমরা যে কোনো গাছের পাতার গুণ লিখে জানাবে। আমি একটা এ্যালবামে সব লিখে রাখবো। রোগের নাম লিখলেই চলবে না। লিখো কেমন করে ওষুধটা বানাতে হয়।

সন্দীপ চ্যাটার্জী।
গোবিন্দ পাল রোড, হাওড়া–২

শিলঙ থেকে বলছি

সবাই প্রথমে আমার শুভেচ্ছা নাও আমি এক কিশোর। আমাকে সবাই শ্যামল ব্যানার্জী নামে চেনে। তোমরাও এই নামেই ডেকো। বয়স ১৩ বৎসর।

আমার হবি চিঠি লেখা। সিনেমা দেখা। গল্পের বই পড়া। আর যখন ইচ্ছে রং পেন্সিল বা রং তুলি নিয়ে বসে পড়ি ছবি আঁকতে।

পাহাড়ী দেশ শিলঙে আমার বাড়ী। তোমরা কে কোথায় থাকো জানিনা। বন্ধুত্ব হলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে, তাই না ?

তোমাদের চিঠি পাবো বলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকব। পিওন এলেই ভাববো তোমরা চিঠি দিয়েছ। কি দেবে তো ?

শ্যামল ব্যানার্জী ১৩ বছর
C/o ডি. বি. দেব।
জি. এম. টি. অফিস
শিলঙ | মেঘালয় | ৭৯৩০০১

সাংবাদিক বন্ধু চাই

গ্রামের ছেলে আমি। নাম সুব্রত মুখার্জী। কিন্তু আমাদের গ্রাম সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত। কখনো কখনো মনে হয় কোলকাতা থেকে অনেক অনেক দূরে থেকেও আমরা নাগরিকত্বের গর্ব করতে পারি। কারণ কোলকাতার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বিষাক্ত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আলো বাতাসের খুব অভাব। অভাব টাট্‌কা সব্জিরও।

খেলা খুব প্রিয়। বিশেষ করে ফুটবল ও ক্রিকেট। ভাল খেলার চেষ্টা করি।

আমি কিন্তু মোহনবাগান সাপোর্টার। তবে ইস্ট-বেঙ্গলের সাপোর্টার বন্ধুও চিঠি দিতে পার।

সুব্রত মুখার্জী
কালী সংঘ রোড
পোঃ—নিকুঞ্জপুর।
পিন—৭২২১৪৪

দেয়ানেয়া

বন্ধুদের সাথে

আমি রণদেব গোস্বামী। আমি চাই বন্ধুত্ব। আমার নিজস্ব সখ অনেক আছে। কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লাগে বন্ধুদের সাথে হৈ হৈ করে দল বেঁধে খেলতে। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় চিড়িয়াখানায়, জাদুঘরে যাই। পিকনিক করি। দুবছর ধরে সরস্বতী পুজো করছি। যা করি আমরা বন্ধুরা। বড়রা কেউ নেই। সম্প্রতি আমরা কিশোর পত্রিকা বার করেছি। যারা বন্ধুত্ব করতে চাও চিঠি দাও।

রণদেব গোস্বামী—১৩
১০৯ | ৩২ হাজরা রোড
কলিকাতা–৭০০০২৬

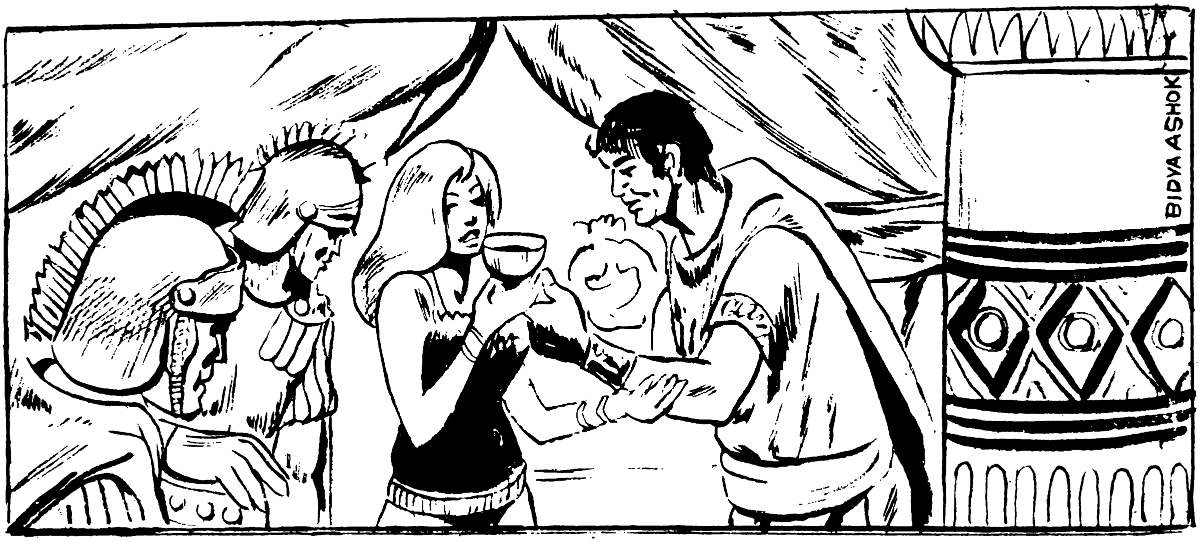

রাণী পেনেলপির দ্বিতীয় বার স্বয়ম্বর সভা

বিমলকান্তি দাস

রাণী পেনেলপি ছিলেন ইথাকার রাজা উলিসিসের প্রিয় স্ত্রী। তিনি ছিলেন অতি সুন্দরী। রাজা উলিসিস তার প্রিয় ধনুকটি তাঁর স্ত্রীর কাছে রেখে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধে গেছেন। বহু বছর হয়ে গেলো। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু এখনো উলিসিসের ফেরার কোন পাত্তা নেই। ইথাকার রাজ্যবাসীরা সকলেই ধরে নিয়েছেন যে উলিসিস নিশ্চয়ই যুদ্ধে মারা গেছেন। এদিকে পেনেলপিকে বিয়ে করার জন্য অনেক রাজ পুরুষ বিরক্ত করতে লাগলেন। কিন্তু পেনেলপি তাদের বলেন, "বন্ধুগণ এভাবে একজন মানুষকে অপমান করার কি অর্থ। আমি জানি আমার বীর প্রিয়তম সামান্য যুদ্ধে প্রাণ হারাতে পারেন না। বিশ্বাস করুন তিনি নিশ্চয়ই এখনো বেঁচে আছেন।" রোজই রাণী ভাবেন এই বুঝি উলিসিস ফিরে এলেন। কিন্তু কোথায় উলিসিস—তিনি কি জীবিত! নতুবা তবে তাঁর ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

কারণ ফিরে আসতে তাকে এবং তাঁর সৈন্যদলকে অনেক বিপদের সামনে পড়তে হচ্ছে। সেই বিপদের ঘটনাগুলি যেমন ভয়ানক আবার তেমন সুন্দরও বটে! যেমন তার মধ্যে একটি ঘটনার কথা বলছি। ট্রয় জয় করে উলিসিস সৈন্যদল নিয়ে জলপথে জাহাজে ফিরছেন। দীর্ঘদিন জাহাজে চলতে চলতে ক্লান্ত উলিসিস একদিন দেখেন, সামনেই একটি দ্বীপ। খাদ্যের সন্ধানে সৈনদল নিয়ে সেই দ্বীপে নামলেন। সেদিনের মতো বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে উলিসিস একটি উঁচু টিলার উপর উঠলেন। ঝলমলে ভোরের আলোয় চোখে পড়ল, দুরে একটি প্রাসাদ।

চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি—"ওই তো, ওই তো বাড়ী দেখা যাচ্ছে! সেনাপতি! তৈরী হয়ে নাও। বাড়ীটা কেউ থাক বা না থাক্ আমরা যাবই। একবার তোমরা দেখে এস। পুরো দলটা মাথা গোঁজার মত জায়গাটুকু ওখানে জুটবে কিনা।"

সকলেই ক্লান্ত। তবু রাজার আদেশ। দলপতিটি তার সৈন্যদল নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে উলিসিস চলেছেন, গোপনে তাদের অনুসরণ করে। লুকিয়ে দেখলেন দলটি ধীরে ধীরে পুরোণো বাড়ীটির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তারপর দেখলেন এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিরাট বারান্দায় বসালেন। কিছুক্ষণ পরেই তার চল্লিশজন সুন্দরী পরিচারিকা নানা রকমের খাবার এনে তাদের খাওয়াতে লাগলো। তারা চলে যেতেই আরো চল্লিশজন পরিচারিকা পানীয় সাজিয়ে নিয়ে এলো। ঐ অপরূপ সুন্দরী মহিলাটি নিজে হাতে প্রত্যেক সৈন্যকে পানীয় দিলেন। ঐ পানীয় পান করা মাত্রেই প্রত্যেক সৈন্যই এক একটি শুয়োরে পরিণত হয়ে গেলো। তারপর দুটি পরিচারিকা লাঠি দিয়ে তাড়াতে তাড়াতে শুয়োরগুলিকে

নিয়ে খোয়াড়ে রেখে দিলো।

উলিসিস চমকে উঠলেন। তাঁর আর বুঝতে বাকি রইলো না যে এই তবে সেই মহাডাকিনী সার্সি। যার ভয়ে কেউই এই দ্বীপে আসে না। উলিসিস জানতেন কি ভাবে এই সার্সি-র যাদুর হাত থেকে বাঁচা যায়।

পাহাড়ী জঙ্গলে এক রকমের ধবধবে সাদা ফুল পাওয়া যায়। সেই ফুল হাতে থাকা অবস্থায় কোন মহাডাকিনীই তার মন্ত্র দেওয়া পানীয় পান করিয়ে কাউকেই শুয়োরে পরিণত করতে পারবে না। উলিসিস দ্রুত সেই ফুল খুঁজতে ছুটে গেলেন নিজে।

কিছুক্ষণ খুঁজতেই সেই ফুল পেয়ে গেলেন। সেই ফুল হাতে নিয়ে সেই পুরোণো বাড়ীর গেটে যাওয়া মাত্র—"আসুন! আসুন রাজপুরুষ। আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

এই ভাবে সুন্দরী ডাকিনী সার্সি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। যত্ন করে বসালেন অতিথিকে। তার পরিচারিকারা আগের মতোই ভালো ভালো খাবার এনে তার সামনে রাখলো। উলিসিস পটাপট সব খাবারই খেয়ে নিলেন। এইবার সার্সি তার মন্ত্র দেওয়া পানীয় উলিসিস-এর হাতে দিলে উলিসিস কোন রকম দ্বিধা না করেই সেই পানীয় পান করলেন ঢক্‌ঢক্‌ করে।

একি! উলিসিস তো শুয়োর হয়ে গেলো না! তাই দেখে ডাকিনী সার্সি আতঙ্কিত! জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

উলিসিস তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। বল্লেন—তোমার ডাকিনী মন্ত্র আমার কাছে পরাজিত। পরাজয় স্বীকার না করলে....। সার্সি নতজানু হয়ে বললে—"তোমার ও তোমার সৈন্যদের কোন ক্ষতি আমি করবো না। আমাকে ক্ষমা করো।"

উলিসিস কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার খুলে বললেন,—"তোমার কথায় কোন বিশ্বাস নেই, তুমি প্রতিজ্ঞা কর—আর কখনোই কাউকে কোন বিপদে ফেলবে না। বা কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না। সার্সি তাই-ই প্রতিজ্ঞা করলো। উলিসিস এবার বললেন আমার সব সৈন্যদের তুমি কিছুক্ষণ আগে শুয়োর বানিয়ে তোমার খোয়াড়ে রেখে দিয়েছো, তাদের মুক্তি দাও। নইলে তোমাকে একেবারে কেটে দুটুকরো করে ফেলবো।

সার্সি তার মন্ত্র দেওয়া তেল শুয়োরগুলির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের দল মানুষ হয়ে গেলো। উলিসিসকে খুশী করতে পারায় সার্সি তাঁকে তাঁর সৈনদল নিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন। উলিসিস খুশী হয়ে প্রায় এক বছর সার্সির আতিথেয়তা রক্ষা করেছিলেন। বিদায় কালে সার্সি ভীষণ কান্নাকাটি করেছিলেন। শুধু তাই নয় ইথাকায় পৌঁছাতে পথে আরো যেখানে যেখানে কি কি বিপদে পড়তে হবে এবং সেই সেই বিপদ থেকে কি কি উপায়ে মুক্তি পেতে হবে তা সব ভালো করে উলিসিসকে সার্সি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভারাক্রান্ত মনে উলিসিস সৈনদল ও প্রচুর খাদ্য সঙ্গে নিয়ে ইথাকার দিকে রওনা দিলেন। পথে সার্সি যে সব বিপদের কথাগুলি বলেছিলেন উলিসিসকে সেই সব বিপদে পড়তে হয়েছিল।

কিন্তু সার্সির উপদেশ মতো কাজ করায় সেইসব বিপদ তাঁকে মোটেই কাবু করতে পারেনি। অবশ্য ইথাকায় পৌঁছাতে আরও আট নয় বছর লেগেছিলো। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ঐ অবস্থায় যখন ইথাকায় তাঁর প্রাসাদের কাছে পৌঁছালেন তখন শুনতে পেলেন—রাণী পেনেলপি দীর্ঘদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত আজ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন। বহু দেশ থেকে রাজা ও রাজপুরুষরা সেই স্বয়ম্বর সভায় এসেছেন। পেনেলপি ঘোষণা করেছেন যে উলিসিসের এই ধনুকে শুণ পরিয়ে তীর ছুঁড়তে পারবেন সেই তাঁকে বিয়ে করতে পারবে।

পেনেলপির বিশ্বাস ছিলো যে উলিসিস এখনো বেঁচে আছেন এবং এই কাজ উলিসিস ছাড়া আর কেউই পারবেন না। তাই ঠিক হলো, কোন রাজা ও রাজপুরুষই ঐ ধনুকে শুণ পরিয়ে তীর ছুঁড়তে পারলেন না। ঠিক এই সময় উলিসিস স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করে ঐ ধনুকে শুণ পরিয়ে তীর ছুঁড়লেন এবং তাঁর স্ত্রীকে আবার ফিরে পেলেন। সারা প্রাসাদে আনন্দ ও খুশীর জোয়ারের বান ডেকে আনলো।

দুঃসাহসী মানুষ ঈগল

শ্যামলী বসু

ফেলে আসা অনেক বছর আগেকার কথা, তখন আফ্রিকা মহাদেশের জায়গায় জায়গায় রেলপথ সবে খোলা হচ্ছে। ঘোড়ায় টানা গাড়ী আর ঘোড়ার পিঠে চেপেই লোকে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াত করত।

ট্রান্সভাল অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর তখন বেশ সুনাম। এই বিভাগের প্রহরী পুলিশ ছিলেন ঈগল। কানাডার মানুষ তিনি। মাঝারি উচ্চতা। কিন্তু সাহসে ? দুর্বার। প্রমাণ আছে কি !

অবশ্যই। আফ্রিকার প্রান্তরে বুনো সিংহীর সঙ্গে মরণপণ লড়াই ঈগলের বীরত্বের এক বিস্ময়কর স্মৃতি।

ঈগল আর তাঁর এক পুলিশ সঙ্গী ঘোড়ায় চড়ে উত্তর ট্রান্সভালের প্রান্তরে পাহারা দিচ্ছেন। বনের ভেতর দিয়ে চলেছে কয়েকটি ঘোড়ায় টানা গাড়ী। এক পথচারীকে ঈগল শুধালেন—এরা কারা ?

পথচারী—ওরা হল ওলন্দাজ। বণিক। বাণিজ্যের পসরা নিয়ে যাচ্ছে। ভাবছেন ঘোড়ায় কেন ? রেলপথ নেই তো। তাই এভাবেই…।

এগিয়ে যেতে ঈগল দেখলেন বণিকদের সংগে রয়েছে দুটি সিংহ শাবক। যেন সদ্য ধরে আনা। আশ্চর্য। ঘোড়া ছুটিয়ে মুখোমুখি হলেন ওলন্দাজ ব্যবসায়ী দলপতির।

ঈগল—ওহে বিদেশী, এমন সিংহ শিশু পেলে কোথায় ?

দলপতি—স্যার, বনের পথে পেয়ে গেলাম। মা-বাবা কেউ কিন্তু দেখা দেয়নি। একটু ভয় যে ছিল না, তা নয়। তবু ভাল লাগল। কোলে তুলে নিয়ে এলাম বলে এগিয়ে চল্ল দলবল নিয়ে।

পেছন পেছন তাঁর অনেকটা পথ চলে এসেছিলেন হঠাৎ সামনে উদয় হল সঙ্গীটিও। সিংহ-সিংহী, নির্ঘাৎ শাবক দুটির মা-বাপ !

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গুলি ছুঁড়লেন ঈগল। লক্ষ্য সিংহী।

ওদিকে গুলির শব্দ শুনেই সিংহ কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে সোজা ছুটে পালাল ঘনবনের মধ্যে। এদিকে আহত সিংহী আর তার মুখে একা ঈগলকে ফেলে রেখে চোখের পলকে অন্য দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল ঈগলের সঙ্গী।

কাঁধের হাড় ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও সিংহী ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ঘোড়ার পিঠ থেকে খামচে মাটিতে টেনে নামাল ঈগলকে। ঈগল টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। ঠিক সিংহীর দু থাবার নীচে। কিন্তু এমন অবস্থায়ও বুদ্ধি হারান নি। সিংহী তাকে বাগে পাবার আগেই চোখের পলকে তিনি সিংহীর পিঠে চেপে বসে। লোহার মত কঠিন ভাবে তার ডান হাতের দুটি আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন সিংহীর নাকের মধ্যে। সেই সংগে প্রাণপণ শক্তিতে সিংহীর মুখ ওপর দিকে তুলে ধরলেন। যাতে সে হাতে কামড় বসাতে না পারে। (পরে যারা ঐ সিংহীর মৃতদেহ পরীক্ষা

করে দেখেছিলেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে অমন প্রবল চাপে পশুটার 'কার্টিলেজ' বা তরুণাস্থি ভেঙ্গে গিয়েছিল।)

যাই হোক তখনও কিন্তু পিঠের ওপর চেপে বসা শত্রুকে এত সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। ক্রুদ্ধ, আহত, বেকায়দায় পড়া পশু। এক ফাঁকে সেও প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ঈগলকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিছনের থাবা দিয়ে তার উরু ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। ঈগলও সমানে সিংহীর সংঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলেন ভারী বুটের আঘাত দিয়ে দিয়ে। একবার পশু মানুষকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। আবার মানুষ চেপে বসে পশুর পিঠে।

এই লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে সিংহীর ঘনঘন হুঙ্কার আর ঈগলের যন্ত্রণাকাতর চীৎকার পৌঁছে গিয়েছিল ওলান্দাজ ব্যবসায়ী আর তার সঙ্গীদের কানে। বন্দুক নিয়ে তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন যেখানে চলেছে মানুষ আর পশুর অসম লড়াই।

যখন তারা সেখানে পৌঁছলেন, তারা দেখতে পেলেন ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঈগল অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন সিংহীর পিঠ থেকে। তাকে সিংহী বাগে পাবার আগেই ব্যবসায়ী গুলি চালিয়ে শেষ করে দিলেন তাকে। আহত, অচৈতন্য ঈগলকে তুলে তারা পাঠিয়ে দিলেন মেসিনার হাসপাতালে।

সেখানে চোদ্দদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ঈগল শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রচণ্ড সাহসের মত তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তিও সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। তবে তার ক্ষতস্থান পচে ফুলে উঠেছিল। ডাক্তারদের তখন কিছুই করার ছিল না। ট্রান্সভাল পুলিশ-বাহিনী যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈগলকে সমাহিত করলেন।

ঈগলের অশ্বারোহী সঙ্গীটি কিন্তু সহকর্মীদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়েছিল। কেন সে সিংহীর মুখে ঈগলকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। সে সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারে নি। আমতা আমতা করে সে বলেছিল হঠাৎ একজোড়া সিংহ দেখে তার ঘোড়া ভয় পেয়ে অন্যদিকে ছুটে পালিয়েছিল

সোনার ঘুড়ি

চরকা কাটে সুতো
থুরথুরে এক বুড়ি
ঐ ওখানে দূরে
চাঁদটা সোনার ঘুড়ি।

ঠাকুর দাদার গল্প
চাঁদনী রাতে একা
শুনতে শুনতে সেদিন
হঠাৎ বুড়ির দেখা।

চরকা কাটে সুতো
কয়না কথা বুড়ি
যায় চলে যায় দূরে
চাঁদটা সোনার ঘুড়ি।

বুড়ির কাঁধে ঝুলি
রেশমী পাকা চুল
সেই ঝুলিতে আছে
লক্ষ তারার ফুল।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

॥ তালপুকুরে ॥

নির্যাস বসু

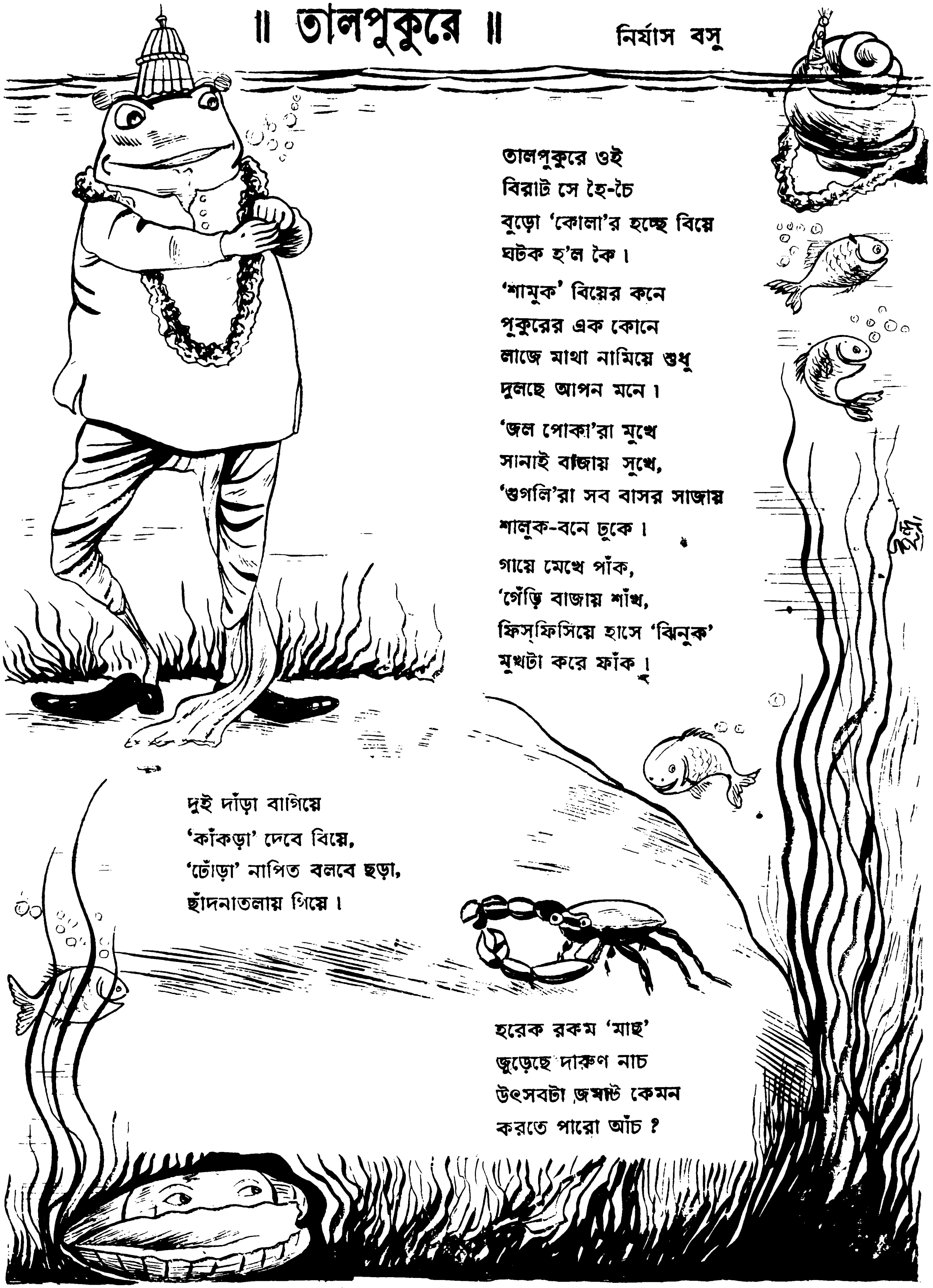

তালপুকুরে ওই
বিরাট সে হৈ-চৈ
বুড়ো 'কোলা'র হচ্ছে বিয়ে
ঘটক হ'ল কৈ।

'শামুক' বিয়ের কনে
পুকুরের এক কোনে
লাজে মাথা নামিয়ে শুধু
দুলছে আপন মনে।

'জল পোকা'রা মুখে
সানাই বাজায় সুখে,
'গুগলি'রা সব বাসর সাজায়
শালুক-বনে ঢুকে।

গায়ে মেখে পাঁক,
'গেঁড়ি' বাজায় শাঁখ,
ফিস্‌ফিসিয়ে হাসে 'ঝিনুক'
মুখটা করে ফাঁক।

দুই দাঁড়া বাগিয়ে
'কাঁকড়া' দেবে বিয়ে,
'চোঁড়া' নাপিত বলবে ছড়া,
ছাঁদনাতলায় গিয়ে।

হরেক রকম 'মাছ'
জুড়েছে দারুণ নাচ
উৎসবটা জমাট কেমন
করতে পারো আঁচ ?

কত অজানারে

পাখীর দুনিয়া ১

তোমরা সবাই কি পড়তে ভালবাস ? না, আমি জানি। পড়াশোনা সবার ভাল লাগে না। কিন্তু গল্প শুনতে ? সব্বাই পছন্দ করে। গল্পের নাম শুনলে আর কোনো কথা নেই। বই খাতা ফেলে চুপটি হয়ে বসে থাকো। আগ্রহে চোখ জুলুজুলু করে। তাই পড়া নয়। আজ তোমাদের সাথে গল্প করব। গল্পটা হবে পাখিদের নিয়ে।

পাখি দেখনি এমন কি কেউ আছো ? অসম্ভব। থাকতেই পারে না। আমরা সকলেই পাখি দেখেছি বা দেখে থাকি। সকালবেলা 'কা-কা' করে যে জীবটি আমাদের ঘুম ভাঙায় সে তো পাখি পরিবারেরই একজন।

এছাড়া সারাদিন চড়ুই, শালিক, দোয়েল, পায়রা, ডাহুক, হাঁস, মুরগীও কম দেখি না। এরা সবাই পাখি। আরো অনেক অনেক রকম পাখি রয়েছে। সব পাখি অবশ্য ভারতে দেখা যায় না। কিছু কিছু ভারতে সব সময় বাস করে। কোনো কোনো পাখির দল বিশেষ ঋতুতে উড়ে আসে। আবার ফিরে যায় নিজের দেশে।

পাখিদের কি মজা তাই না ? যখন খুশী যেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারে। আমাদের যদি ওদের মত দুটো পাখা থাকতো, আমরাও ইচ্ছে মত উড়ে বেড়াতাম। চিলের মত উঠে যেতাম আকাশের ভেতর। নীল মেঘে মেঘেদের সাথে লুকোচুরি খেলা যেত বেশ। কিন্তু মানুষের পাখা নেই। পাখি ছাড়া কোনো প্রাণীরই ওড়ার মত পাখা নেই। কবে হবে কেউ বলতে পারে না।

হাজার হাজার বছর আগে পাখিরাও উড়তে পারত না। সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত ছিল তারা। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত রূপ লাভ করে পাখি পায় তার শূন্যে উড়ে বেড়াবার দুটি ডানা। কেমন করে ! বা কবে পাখির দেহে পাখা সৃষ্টি হল ? প্রাণী বিজ্ঞানীরা এখনও সেই রহস্যটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁরা কেবলি ভাবছেন আর নতুন নতুন সূত্র খুঁজছেন।

পাখির চেহারা সম্পর্কে কিছু বলতে পারো ? হয় তো পারবে না। কারণ সব পাখি এক রকম দেখতে নয়। আকারেও হয়ে থাকে বিভিন্ন। রঙও নানান ধরণের। কিন্তু কতগুলি বৈশিষ্টে পাখিরা সকলে 'এক'। ঠোঁট, পালক, লেজ, পা, চোখ, মেরুদণ্ড, দাঁত বর্জিত, উড়ে চলা এই বিশেষত্বগুলো অসংখ্য প্রাণী জাত থেকে পাখিকে আলাদা করেছে।

তাদের জীবনধারাও বিচিত্র। সব কথা তো এক সঙ্গে বলা যায় না। যা বল্লেও গোলমেলে এক খিচুড়ি তৈরী হবে। সুতরাং একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর, পাখিদের নিয়ে পর পর অনেক কিছু শুনতে পাবে।

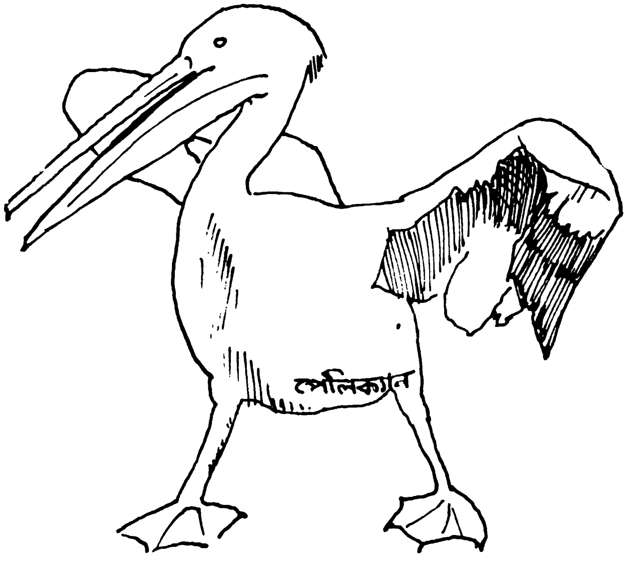

একেক করে বলব পালক, রঙ, ঠোঁট, বাসা, হাজারো নাম, লেজ কাহিনী, জলে ভেসে থাকার ম্যাজিক, যাযাবর হবার কারণ, বুদ্ধিমান পাখির কথা কোন্ পাখি শূণ্যে দাঁড়াতে পারে? কিংবা বেদুইন হাঁসেরা "ভী" ফরমেশনে ওড়ে কেন? এরকম আরো সব চমকপ্রদ ব্যাপার। শুনলে ভাব্‌বে বানিয়ে বলা আজব কথা। পাখি দুনিয়ায় সে সব একেবারে নির্জলা সত্যি কিন্তু।

নরম তুল্‌তুলে পাখির রক্ত মাংসের শরীর ঢেকে রয়েছে অজস্র পালক। সাদা, কালো, নীল, হলুদ, সবুজ আশ্চর্য সুন্দর সব চক্‌চকে পালক দেখেছ নিশ্চয়ই। অন্য পাখি না দেখলেও ময়ূরের পালক সকলের পরিচিত। কার্তিক ঠাকুরের বাহন ময়ূর। দুর্গাপুজোর সময় তার অদ্ভুত পালকের জৌলসে চোখ ঝলসে দেয়নি বললে বিশ্বাস করছি না।

প্রাণী বিজ্ঞানীরা বলেন পাখির শরীরের পালক-গুলো নাকি অন্য প্রাণীর খুড়, শিং বা নখের বিকল্প রূপ মাত্র। শুনলে আরো অবাক হবে, পাখির পালকে কিন্তু কেউ বসে বসে রঙ লাগায় না। পালকের মধ্যে সঞ্চিত ভাণ্ডারে থাকে রঞ্জক পদার্থ। প্রয়োজন মত পালকে সেই ভাণ্ডার থেকেই রঙ প্রলিপ্ত হচ্ছে।

কখনো কখনো খাবারের প্রভাবও রঙ সৃষ্টি করে। যেমন ক্যানারি নামের বিদেশী পাখিরা ডিম ফোটানোর সময় খাবারের সঙ্গে গোল মরিচ খেলে তাদের পালক হলুদ থেকে বদলে দেখায় গাঢ় কমলা রঙের।

পালকগুলো পাখির গায়ে কিভাবে সেঁটে রয়েছে জানো? ওদের শরীরের পাতলা আবরণে যুক্ত রয়েছে সরু নলের মত একরকম কাঠি। কাঠির দুপাশ থেকে বেরিয়েছে পালক। পালকেরা দুরকম। বহিরাঙ্গের এবং আভ্যন্তরীণ। বহিরাঙ্গের অর্থাৎ বাইরের দিকের। বাইরের বলতে বিশেষ করে বুঝতে হবে পাখা ও লেজের পালক। এগুলো হয় অপেক্ষাকৃত শক্ত। কিন্তু পেট, গলা প্রভৃতি অঙ্গের আভ্যন্তরীণ পালক তুলনায় নরম হয়ে থাকে।

বছরে একবার সব পাখির পালক খসে যায়। যেমন ঝরে পড়ে গাছের পুরণো পাতা। গাছের পাতা খসে গেলে নতুন পাতা জন্মায়। পাখিরও পুরণো পালকের কোষ থেকে বেরিয়ে আসে নতুন পালক।

এতক্ষণ সাধারণভাবে পালক আর রঙের কথা হল। এবার বলি রঙের অন্যান্য কারণ। বিজ্ঞানীরা বলেন পাখির রঙ থাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার অন্যতম অবলম্বন।

আবার যে সব পাখির রঙ উজ্জ্বল তারা অধিকাংশ সময় কাটায় গাছের ওপর, আকাশে, জলে। আর যাদের রঙ অপেক্ষাকৃত অনজ্জ্বল তারা বেশী সময় মাটির ওপর, ক্ষেতের ওপর বা কাছাকাছি থাকে।

পুরুষ পাখির তুলনায় স্ত্রী পাখির রঙ কিন্তু অনুজ্জ্বল হয়ে থাকে। প্রকৃতি বিশারদদের মতে স্ত্রী পাখিরা অধিকাংশ সময় বাসায় থাকে এবং ডিমে তা দেয়ার কাজ করে। আর পুরুষ পাখিকে পরিশ্রম করতে হয় বেশী। এছাড়া ডিম ফোটানোর সময় স্ত্রী পাখিকে পাহারায় রাখতে হয়। অর্থাৎ পাখির গাঢ় রঙ তাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্রও।

আমার দেশ

কলিকাতা থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অপূর্ব স্নিগ্ধ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। এইখানেই 'রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র। ১৮৯৭ সালের ১লা মে তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপন করেছিলেন। স্বামীজী এইখানে একটি বাড়ীতে বাস করতেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে 'বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির' তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়। তখনকার দিনে মন্দির সহ এই মঠটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল আট লক্ষ টাকারও বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে দু'জন আমেরিকান ভক্ত মহিলা এবং অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত এই টাকা দান করেছিলেন।

বেলুড় মঠের গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে গির্জা, মসজিদ এবং মন্দিরের আকার দেখা যায়।

গঙ্গার তীরে বেলুড় মঠ এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ছোটবড় সকলেরই খুব ভাল লাগে। সকলেই শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের লোক ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক শ্রদ্ধায় অবনত চিত্তে এখানে ছুটে আসেন।

আলোকচিত্র ও বিবরণ—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

আজব কথা আজব ভাবনা

অমিতাভ চৌধুরি

এত লম্বা ফ্লাইওভার এশিয়া কেন, সারা দুনিয়ায় নেই। প্রায় ত্রিশ মাইল লম্বা। চওড়াও তেমনি। এক সঙ্গে চুরাশিখানা গাড়ি পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে। উড়াল পুলের শুরু শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে, শেষ হুগলীর সাহাগঞ্জ ছাড়িয়ে। ডানলপ কারখানা এখন নিউ ক্যালকাটার শহরতলি। চার পাশে আরও অনেক কারখানাও অবশ্য নতুন গজিয়েছে। গলসিতে প্রচুর তেল পাওয়া যাওয়ায় একটি ওয়েল রিফাইনারি, মাত্র দেড় হাজার টাকায় টু সীটার মোটর তৈরীর কারখানা, বিরাট ইলেক-ট্রনিক কমপ্লেক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। পশ্চিম বাংলার নতুন রাজধানী এই নিউ ক্যালকাটা এখন বম্বে-দিল্লী-টোকিও-নিউইয়র্ককে টেক্কা দিয়েছে।

শহরটা সত্যি সত্যি দেখার মতো। ১১৯ তলার চেয়ে কম বাড়ি বানানোর হুকুম নেই, এক একটি বাড়ি তিনশ' চারশ' তলা অবধি। সিক্স টায়ার সেভেন টায়ার প্রত্যেকটি রাস্তা, প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে লাগানো সুইমিং পুল, পেট্রোল পাম্প, পাম্পিং সেন্টার। গাড়ী ঘোড়ায় ধাক্কাধাক্কি নেই। রাস্তা এত চওড়া এবং মোড়ে মোড়ে এত সুন্দর ফ্লাইওভার যে যাতা-য়াত অনায়াস। ছ'তলা সাততলা রাস্তার এক এক তলায় এক এক রকম স্পিড। দেড়শ' কিলো-মিটারে ছুটলে দু'তলা, চার শ' কিলোমিটারে ছুটলে পাঁচ তলা এই রকম আর কি। এক একটি বাসে দু'শ করে প্যাসেঞ্জার। কেউ দাঁড়ালে এক হাজার টাকা ফাইন। বাসের ভিতর চেঁচিয়ে কথা বললে ফাইন দশ হাজার। রিক্সা নেই, ঠেলা নেই, টেম্পো নেই এবং পরম আশ্চর্যের বিষয় লরিও নেই।

লরি, ঠেলা, রিক্সা—এসব গেল কোথায়? কোথাও যায়নি, ওরা বহাল তবিয়তে পুরোণো কল-কাতাতেই আছেন। আগেকার কলকাতা শহর তো বাতিল করে দেওয়া হয়নি। ওখানে এখন শুধু ট্রাক-লরি, রিক্সা-ঠেলা, টেমপো-গরুর গাড়ীর রাজত্ব। আগে যেমন অন্যান্য যানবাহন ওদের চলা-চলে বাধা সৃষ্টি করত, এখন আর সে সমস্যা নেই দিন রাত ২৪ ঘন্টা ওরা যত্রতত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারে। পুরোণো কলকাতায় আর আছেন হকাররা। নিউ ক্যালকাটায় হকারদের প্রবেশ নিষেধ, তাই পুরোণো কলকাতা হকারপুরী। আগেকার রাজভবন, রাইটার্স, এসেম্বলি হাউস, আকাশবাণী ভবন ইত্যাদি হকারে হকারে ছয়লাপ। শুধু হকার নয়, যেহেতু নতুন রাজধানী নিউ ক্যালকাটায় পথে মিছিল বের করা নিষেধ, সেই জন্যে পুরোণো শহরটা ট্রাকওলা ও হকারের মতোই মিছিল ওয়ালাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নানা দাবিতে নানা দলের

নানা মিছিল অষ্ট প্রহর চেঁচায়। নিউ ক্যালকাটার নতুন লোকদের যখন মিছিল দেখার শখ হয়, তখন ওরা হেলিকপটারে চড়ে পুরোণো কলকাতায় আসেন। হকার-মিছিল-ট্রাক নিয়ে অতীতের কলকাতা এক আজব শহর।

মজার ব্যাপার হল, পুরোণো কলকাতার হকার স্টলে জিনিষপত্র সস্তা হওয়ায় নিউ ক্যালকাটা থেকে রোজই হাজার হাজার লোক কেনাকাটা করতে আসেন। ভাল পুঁই ডাঁটা বা কচুশাক কিনতে হলে তো আসতেই হবে। ওই সব সবজিওলা হকাররা গোটা ময়দান ও কলকাতার সব পার্ক সবজি ক্ষেত বানিয়ে ফেলছেন। ময়দানে কচু ভাল ফলে, রবীন্দ্র সরোবরে পুঁই ডাঁটা। ময়দান থেকে কচু তুলেই রাজভবনের চত্বরে বা পুরোণো গ্র্যাণ্ড হোটেলে বিক্রী শুরু হয়ে যায়। ট্রাক ছাড়া অন্য কিছু রাস্তায় চলে না বলে রেড রোড ক্যাজুরিণা এভিনিউ ইত্যাদি বড় বড় রাস্তাও এখন হকারদের দখলে। পুরোণো কলকাতায় অবশ্য সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আণ্ডার-গ্রাউণ্ড হকার স্টল। ১৯৯৯ সালেও পাতাল রেলের কাজ শেষ করতে না পেরে অধৈর্য ও বিরক্ত পাতাল রেলের কর্মীরা সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেছেন। এস-প্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ—আণ্ডার গ্রাউণ্ডের সব ব্যবস্থা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ায় হকাররা দলে দলে মাটির তলায় চলে গেছেন। শুধু তাই নয় মনুমেন্টের চূড়ায়ও হকার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের ভেতরে বাইরেও হকার। অর্থাৎ এখন উপরে নিজে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে কেবল হকার আর হকার। সত্যি বাঙালীর আর একটি গর্বের জিনিষ বাড়ল। নিউ ক্যালকাটা আর ওল্ড ক্যালকাটা—দুটোই বৈশিষ্ট্যে ও অভিনবত্বে অনন্য।

ভূতের দেশে ভূতনাথ

বিদ্যুৎ মল্লিক

ভূতনাথকে নিয়ে ভারি মুশকিল। কেউ তার কোন কাজেই সন্তুষ্ট নয়। কেউ তাকে বলে গবেট কেউ বলে বুদ্ধু, আবার কেউ বা বলে হাঁদা। কেউ কেউ আবার সরাসরি তাকে 'ভূতনাথ' বলেও ডাকে। তবে মূর্খমীর জন্য বাড়িতে কেউ তাকে সহ্য করতে পারে না। আর বাইরে তো ভূতনাথকে নিয়ে সবাই মজা করে। ভূতনাথ একবার স্কুলেও ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও সে টিকতে পারল না। স্কুলের ছেলেরা তাকে পাত্তাই দিত না। মাষ্টার মশাই পড়া জিজ্ঞেস করলে মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত—যেন সে কানে শুনতেই পায় না, এমন একটা ভাব। শেষে একদিন হেড-মাষ্টার মশাই তাকে ডেকে বললেন, ওরে ভূতনাথ, তোর মাথায় তো দেখছি গোবর পোরা, তোকে আর কাল থেকে স্কুলে আসতে হবে না। শুধু শুধু এখানে এসে লাভ কি তোর দ্বারা লেখাপড়া হবে না।

ভূতনাথ নির্বিবাদে একথা তার মাকে গিয়ে বলল। মা বলল তার বাবাকে। সব শুনে বাবা বলল, হেড-মাষ্টার ঠিকই মশাই বলেছেন, তোর মত মোটা বুদ্ধির দ্বারা লেখাপড়া হবে না, তার চেয়ে তোকে কোথাও কাজে-টাজে লাগিয়ে দেব।

ভূতনাথদের অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। কোন রকমে তাদের দিন চলত। অতএব তার বাবা চেষ্টা-চরিত্র করে ভূতনাথকে একজনের বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিল। ভূতনাথ সেখানেই থাকে, খায়-দায়, কাজ করে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে বাড়ির গিন্নীমা ভূতনাথের আসল পরিচয়টা পেয়ে গেলেন। ভূতনাথ যে একেবারে বোকার হদ্দ, কোন কাজই যে তার দ্বারা করা সম্ভব নয়, এ কথা গিন্নীমা

একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। তিনি যে কাজটাই করতে বলেন সে কাজটাই ভুতনাথ পণ্ড করে বসে। রেগে গিয়ে যা-তা করে গিন্নীমা তাকে তিরস্কার করেন, কিন্তু ভূতনাথের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বকুনি খেয়ে পর মুহূর্তেই সে খিল্-খিল্ করে হাসতে হাসতে খেতে চায়। ভূতনাথের এই আচরণ দেখে গিন্নীমা তো একেবারে রেগে আগুন। তিনি না পারেন তাকে মারতে, না পারেন ধমকাতে, না পারেন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। কারণ এসব করে কিছু লাভ নেই—এসব অপমান ভূতনাথের গায়ে লাগেই না।

শেষে একদিন ভূতনাথ একটা গুরুতর অন্যায় করে বসল। অনেক দিনের পুরণো শ্বেত পাথরের তৈরী একটি তাজমহল ছিল তাকের ওপর। জিনিসটা বেশ দামী। ভূতনাথ সেদিন সন্ধ্যেবেলা গিন্নীমায়ের চ্যবনপ্রাশের শিশিটা তাক থেকে পাড়তে গিয়ে অত সুন্দর তাজমহলটা দিল মাটিতে ফেলে—ভেঙে একেবারে টুকুরো টুকরো হয়ে গেল জিনিষটা। তাই দেখে গিন্নীমায়ের বুকে যেন শেল বিঁধল, সে আঘাত তিনি সইতে পারলেন না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাজ পাখীর মত তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভূতনাথের ওপর। তারপর দিশেহারার মত মারতে মারতে সেই সন্ধ্যেবেলাই তিনি ভূতনাথকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন।

ভূতনাথ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। রাস্তায় এয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে কিছুক্ষণ চিন্তা করল, কোথায় যাবে সে? কিছুই ভেবে পেল না। একবার বাড়ির কথা মনে হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি লাভ? বাড়িতেও তো কেউ তাকে দেখতে পারে না। আর তাছাড়া এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাবার পথও সে চেনে না। অতএব উদ্দেশ্যহীনভাবে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বড় রাস্তা ছেড়ে সে এসে হাজির হল একটা বিশাল কবরখানার সামনে। কবরখানা সে এর আগে দেখেনি কখনো। তাই কি এক কৌতূহল বশে সেই রাতের অন্ধকারেই ভূতনাথ আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল সেখানে।

আবছা চাঁদের আলোয় ভূতনাথ সারা কবরখানাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। নাম-না-জানা অসংখ্য গাছের নীচে ছোট্ট বড় সিমেন্টে বাঁধানো সব বেদী। কোথাও কোথাও আবার বেদীর ওপর সুন্দর সুন্দর মন্দিরের মত বানানো। মাঝে মাঝে গাছের ডাল থেকে পেঁচা আর তক্ষকের ডাক শোনা যাচ্ছে। ভূতনাথের যেন একটু ভয় ভয় করতে লাগল। তবু সে কি এক নেশার বসে কবরের চারদিকটা ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় সে শেয়ালের ডাক শুনতে পেয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল যেন। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগল। কিছুটা দৌড়ে আসতেই সামনে একটা অনেক দিনের ভাঙ্গাচোরা পুরণো মসজিদ দেখতে পেল। মসজিদের সব কটা দেওয়াল জুড়ে অসংখ্য গাছের ঝুরি নেমেছে। কোথাও কোথাও দেয়ালের ইঁট খসে পড়েছে। চারিদিক থেকে অসংখ্য ঝিঁ-ঝি পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছিল ভূতনাথ। আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা সে মসজিদের ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাই সে বেশী দুর যেতে পারল না। সামনেই দেওয়াল ঘেঁসে বসে পড়ল। তারপর দু'হাতের তালুতে নিজের চোখ দুটো চাপা দিয়ে জড়সড় হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সময় গুণতে লাগল ভূতনাথ।

এমনি করে কতটা সময় যে কেটে গেছে, সে খেয়াল ছিল না ভূতনাথের। বসে থাকতে থাকতে থাকতে এক সময় তন্দ্রা এসে গিয়েছিল তার। হঠাৎ কার যেন ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ তুলে দেখল সে হ্যারিকেন হাতে তারই সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে। লোকটির পরণে আঁটসাঁট সুন্দর পোষাক, কোমরে মেরুন রঙের বেল্ট, মাথায় জরির কাজ করা সাদা পাগড়ি, পায়ে ভেলভেটের নাগরা, চোখের কোলে সুর্মা, আর কাঁচাপাকা দাড়ি। লোকটির গা থেকে সুন্দর আতরের গন্ধ পেল ভূতনাথ। হ্যারিকেনটা ভূতনাথের মুখের কাছে নামিয়ে এনে লোকটি খনা গলায় বলল, কি হে ভূতনাথ, এখানে এমন করে বসে কেন? এস, আমার সঙ্গে ভেতরে এস।

ভাঙ্গা এই মসজিদের মধ্যে এত রাত্রে কোথা থেকে যে এই লোকটা এসে হাজির হল ভূতনাথ কিছুই বুঝতে পারল না। এমন কি কোন প্রশ্নও

করতে পারল না সে। মনে হল কে যেন দু'হাতে তার কন্ঠস্বর রুদ্ধ করে দিল। ভূতনাথ যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়িয়ে লোকটিকে অনুসরণ করল। হ্যারিকেনের টিম্‌টিমে আলোতেও যেন মনে হল সেখানে উজ্জ্বল নিয়ন-বাতি জ্বলছে। ভূতনাথের মনে হল, সে যেন লোকটির পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে কোথায় নেমে এল। তারপর একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘরের দরজাটা আপনিই খুলে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকেই ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। সারা ঘরটা স্বর্গের মত করে সাজানো। ঘরের এক কোণে একটা সুদৃশ্য সিংহাসন পাতা। পাশেই একটা বহুমূল্য পালংক। লোকটি ভূতনাথকে পালংকটি দেখিয়ে বলল, তুমি ওখানে গিয়ে বস, আমি এক্ষুনি আসছি। বলে সে মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল।

ভূতনাথ বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল তারপর এক সময় হঠাৎ পাশ ফিরতেই সে চমকে উঠে দেখল সেই সিংহাসনে একজন রাজার মত পোষাক পরা সুপুরুষ যুবক বসে আছে। ভূতনাথ কিছুতেই বুঝে পেল না, এই রাজাটি কখন কোথা দিয়ে কি ভাবে এসে হাজির হল এখানে? রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, ভূতনাথ, তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে? তুমি কি কিছু খাবে?

ভূতনাথের হঠাৎ যেন খেয়াল হল, সত্যিই তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় তার পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ রাজামশাই, আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা শূন্যে বাড়াতেই একটা সুন্দর রূপোর থালা এসে গেল তার হাতে। তারপর বাঁ-হাতের তালুটা থালার ওপর বুলিয়ে দিতেই কোথা থেকে একরাশ সুস্বাদু খাবার-দাবারে ভরে গেল থালাটা। ভূতনাথ ছুটে গিয়ে থালাটা ধরে নিল রাজার হাত থেকে। থালাটা নিতে গিয়ে তার হাতটা যেন কিভাবে ঠেকে গেল রাজার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিমশীতল স্পর্শ পেল ভূতনাথ। কিন্তু সে সব খেয়াল করার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না ভূতনাথের। সে তাড়াতাড়ি করে পালংকে বসেই খেতে লাগল খাবারগুলো। এত ভাল ভাল খাবার সে অনেক দিন খায়নি। খাবার শেষ হতে ভূতনাথ ফিরে দেখল সিংহাসনে রাজা আর তখন নেই, সিংহাসন ফাঁকা। কিন্তু রাজা গেল কোথায়?

হঠাৎ চোখের পলক ফেলতেই ভূতনাথ দেখল সেই পাগড়ী পরা লোকটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে আবার। ভূতনাথ খুব ভাল করে লক্ষ্য করল, লোকটির চোখের পাতা পড়ে না। নিঃশ্বাসও ফেলছে বলে মনে হল না। তার দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে। হাত দুটো কংকালের মত রোগা আর সাদা। কোমরের নিচের অংশটা অদৃশ্য। ভূতনাথ লক্ষ্য করল, লোকটি তার কাছে এলেই কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে এসে লাগে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যের মত মনে হতে লাগল তার কাছে।

এক সময় লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, ভূতনাথ তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে গেলে না কেন?

ভূতনাথ করুণ সুরে বলল, বাড়িতে আমায় কেউ দেখতে পারে না, সবাই আমাকে বোকা বলে, সেখানে গিয়ে কি লাভ?

ভূতনাথের কথা শুনে লোকটির বোধহয় দয়া হল, সে বলল, বল ভূতনাথ, তোমার কি চাই? তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

(৩২ পাতায় দেখুন)

রহস্য বাংলো

সঞ্জীব বসু

(গত সংখ্যার পর)

না, পিস্তল কোথায় খুঁজে পাব এখানে ? আমার তো পিস্তল নেই…অমিতেরও নেই। তবে কেন পিস্তল চাইছি ?

অমিত আমাকে জোর করে বাথরুমের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে আমি চেঁচিয়ে বল্লাম—দ্যাখ্ দ্যাখ্ লোকটা কেমন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাসছে কেন ওভাবে ? অমিত প্লিজ সত্যি করে বলতো তুই কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না ?

—না, তোর দেখ্ছি মাথা খারাপ সত্যি হয়েছে। চল্ বাথরুমে চল্ মাথায় জল দিবি। আরে তোরা কলকাতার ছেলে…ভূতকে এত ভয় ?

—তুই কি আমাকে ভয় পেতে দেখ্ছিস্ ? কিন্তু একটা লোক রাতের বেলায়, দিনের বেলায় আমার পেছনে কেন এভাবে ঘুরবে ? আমি দেখলাম, তুই দেখছিস না…এটা তো আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। আমার কিস্সু হয়নি। আমি লোকটাকে দেখব…দেখি ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে…আরে গেল কোথায় ? এই তো এখানে ছিল।

অমিত হাসতে হাসতে বলে—সত্যি বলছি তুই মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয়।

লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক্ সেখানে গিয়ে আমি ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম যদি কিছু পড়ে থাকে। কিন্তু তেমন কিছু পেলুম না।

ভোর হতে দেরী আছে। তবু আর বিছানায় শুলাম না। অমিত হেসে বলে—আরে ভূতটুত কিছুই নয়। এসব মনের ভ্রান্তি। তুই যদি বলিস্ তোকে না হয় বি-ডি-ওর গেস্ট হাউসে রেখে আসব।

আমি বল্লাম—তার প্রয়োজন নেই। আমি কালই ফিরে যাব কলকাতায়। বেড়াতে এসে এভাবে…। তাছাড়া আমি বুঝতে পারছি না তোদের ম্যানেজার হঠাৎ আমার ওপর ভর করতে চাইছে কেন ?

—সেই প্রশ্নটা আমারও। আচ্ছা এককাজ করলে হয় না…প্ল্যানচেট করলে কেমন হয় ? তাহলে ওকে সব জিজ্ঞেস করলেই বোঝা যাবে।

দূর…আমি ওসব বিশ্বাস করি না। যত সব বুজরুকি।

—না…প্ল্যানচেটেই হবে। এবং এই এখুনি। দ্যাখ্ তুই যদি ভীতু না হোস্ তবে ম্যানেজার সাহেবের কি ইচ্ছে আজই জানা যাবে।

অমিতের কথাটা একটু বিবেচনা করে ভাবলাম্ …ঠিকই তো, কি চায় লোকটা অর্থাৎ ম্যানেজার ভূত। আজই জানতে হবে। তারপর কাল কলকাতার দিকে ছুট্। না, ভয়ে নয়, অত্যাচারে।

আমি রাজী হতেই অমিত মেঝেতে বসে পড়ল আমাকে বসতে ইসারা করে। সবুজ জিরো পাওয়ারের লাইট জ্বালিয়ে ধূপকাঠির একরাশ ধুয়ো দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নিল। আমাকে বল্ল—ভয় পাবি না। অন্তর দিয়ে ম্যানেজারকে কাছে ডাকবি। জানতে চাইবি কেন তোকে বারবার দেখা দিচ্ছে ? নে রেডি তো ?

১০।১৫ মিনিট সব চুপচাপ। দুজনেই মনে মনে ম্যানেজার ভূতকে সশরীরে আবার দেখা দিতে বলছি। ধূপ কাঠির আগুন যখন প্রায় নিভু নিভু তখন একটি বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ মূর্তি ভেসে উঠল আমাদের দুজনের চোখের ওপর। অমিত অস্পষ্ট গলায় বল্ল—ম্যানেজারবাবু….? আপনি কেন আমার বন্ধুকে এ ভাবে বার বার বিরক্ত করছেন ? ও কি দোষ করেছে ?

ম্যানেজার ভূতকে পুরো না দেখলেও কিছু যে বলতে চাইছে তা বোঝা গেল। মুখে নয়, ইসারায়। এবং অমিতকেই যেন কি বলতে চাইছে।

আর তখনই লোড্ শেডিং-এ সবুজ বাতিটা নিভে গেল। অমিত দু-চারবার চেঁচিয়ে বল্ল—কিছু বলুন

ম্যানেজার বাবু। চলে যাবেন না। বলুন কিছু।

সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল—প্ল্যানচেট মিডিয়ামের মুখ দিয়ে কথা আসে। যাকে প্ল্যানচেট করা হয় সে কথা বলেন। এর জন্যই বোধহয় ম্যানেজার ভূত পালিয়ে গেল।

যাই হোক…অমিত ভয় পেয়ে গেল কিনা জানি না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাই জ্বালিয়ে ঘরটা একবার দেখে নিয়ে বলে—আজ থাক্। কাল আবার বসব। চল একটু ঘুমিয়ে নিই।

০ ০ ০ ০

পরদিন সকালে অমিতকে না জানিয়ে একা একাই বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য থানায় গিয়ে খোঁজ নেওয়া যে ম্যানেজার বাবু সত্যি মরেছে তো? কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে আমার। কিছুদূর যেতেই দেখি ঠিক্ আমার বিপরীত দিক থেকে সাইকেল নিয়ে একজন স্পীডে এগিয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ আমাকে দেখে রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে ঢুকে গেল।

আরে…এ তো ম্যানেজার বাবু। সাইকেল চেপে ভূত ম্যানেজার দিনের বেলায়? তার মানে…ছুট্-লাম...খুব জোরে জঙ্গলের দিকে, যে দিকে ম্যানেজার বাবু গেছেন। কিছুদূর যেতেই দেখি সাইকেলটা এক পাশে পড়ে আছে। আর লোকটি মাটিতে গড়াচ্ছে। আমি কাছে যেতেই চেঁচিয়ে বলে—আরে দাঁড়িয়ে দেখছো কি একটু হাত ধরে ওঠাও না?

—ভূতের হাত ধরে....না, কিন্তু এ কেমন ভূত। মানুষ দেখেই পালায়।

—রাতের বেলায় ভূত, দিনের বেলায় নয়। ধরুন বোধহয় পা-টা মচকেই গেছে।

হাত ধরে ম্যানেজারকে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলাম—বলি এসব কাণ্ড করার কি দরকার ছিল? আবার প্ল্যানচেটে ভূত সেজে এসেছে।

—না সব তোমার বন্ধুর দোষ। কলকাতার ছেলেকে ভীতু বলে অপদস্থ করার জন্য আমাকে ভূত সাজিয়েছে। আরে আমি তো ভয়ে মরি। কখন তুমি কি করে বস। যদি ভয়ে মরে যেতে তাহলে?

—অত সোজা নয়। এখন বলুন তো এভাবে দিনের আলোয় ধরা না পড়লে আর কি করতেন?

—আজই সারেণ্ডার করে দিতাম। সেকথাই তোমার বন্ধুকে বলতে যাচ্ছিলাম। পথে তোমার সাথে দেখা। যাক্ চল এবার....ভূতের ভয়ে মানুষ কাত্ না হয়ে এখানে মানুষের ভয়ে ভূত কাত্ হয়ে গেল।

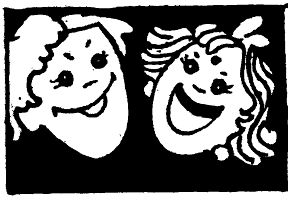

হাসির উড়মেলা

রসময়

একব্যক্তি আরেকজনকে—আপনি কোথায় থাকেন ?

—তালতলা। আর আপনি ?

—নাকতলা।

ওদের দুইজনের কথাশুনে অপর এক ব্যক্তি বলে ওঠেন—আমি ভাই নাকতলা, তালতলায় থাকি না। আমি থাকি ওপর তলায়। সেখানে তাল পড়ারও ভয় নেই, আর সর্দি কাসি হলে ইয়ে পড়ারও ভয় নেই।

এক কবির কবিতা অনুষ্ঠানে প্যাণ্ডেল প্রায় জনশূন্য। কিন্তু সামনের সারিতে একদল ছেলে বসেছিল। 'কবির কবিতা পাঠ শেষ হতেই ছেলেগুলোকে কবি বল্লেন—সত্যি ভাই তোমাদের মত সমঝদার ছেলে আজকাল দেখাই যায় না। তোমরা আমার কবিতা শুনলে মন দিয়ে।

ছেলেগুলো বল্ল—না কবিমশাই, আমরা শ্রোতা নই। পাড়ায় সরস্বতী পুজো হবে। পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে হবে। তাঁর জন্যে বসে আছি।

বড় হলে তুমি কি হবে বুকু ?

—কেন ? তখন বুকুবাবু।

—না....ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার কিংবা....

—ওঃ, না আজকাল ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হয়ে কোন লাভ নেই। আমি সারা বিশ্বে নামী হবার জন্য অলিম্পিক গেমসের ম্যাসকট হতে চাই।

o এই যে অমনই হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছেন কোথায় ?

—আর বলবেন না, কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথায় একটিও চুল নেই, তাই কালী বাড়ী মানত করতে যাচ্ছি সব চুল দিয়ে দেব বলে, যদি চুল না ওঠে।

o এই বুকু খেজুর গাছের নীচে কি খুঁজছিস্ ?

—মরুভূমি ?

—তার মানে ?

—মরুভূমিতেই তো খেজুর গাছই থাকে। তা-হলে খেজুর গাছের নীচে কেন মরুভূমি থাকবে না ?

o আলোর গতিবেগ বেশী না শব্দের ? মাস্টার মশাই এই প্রশ্ন করলে এক ছাত্র উত্তর দিল—স্যার শব্দের। গতকাল আমাদের বাড়ী চোর এসে আল-মারী ভাঙতেই শব্দ পেলাম। কিন্তু লোড্ শেডিং-এর জন্য চোর ধরতে পারলাম না।

o ডাক্তারবাবু আমায় বাঁচান।

—কেন কি হল আপনার ?

—আজ্ঞে লোকের থেকে টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতে মনে থাকে না। স্মৃতি শক্তি একেবারে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

o জানিস অমর এবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাবার কথা ছিল ?

—তা পেলি না কেন ?

—সামান্য একটু ভুলের জন্য। একটি বাচ্চা জলে পড়ে গিয়েছিল। জল থেকে ওকে তুলতে যেই জলে পা দেব...ওরে বাব্বা কি ঠাণ্ডা জল, উঠে এলাম। বাচ্চা ডুবে যাবার আগে ও পাড়ার হাদু কোট প্যান্ট পরে জলে নেমে বাচ্চাটাকে তুলে আনল। ওই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেল। কিন্তু ওর মত আমি যদি কোট প্যান্ট পরে থাকতাম...।

o দাঁতের ব্যথায় মরে যাচ্ছি ডাক্তারবাবু।

—তুলে দেখুন না দাঁতগুলো।

—তা আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দাঁতে কিড়-মিড় করলে আমার আবার তেমন ঘুম হয় না। আপনি কি বলছেন না ঘুমিয়ে মরে যাই।

একলব্য

চিত্র ও চিত্রনাট্য — শ্রীবিদ্যা অশোক

এই গত দুদিন ধরে কোন লোকজন দেখতে পাইনি. জানিনা ভুল পথে আসছি কিনা। এই ত একটা ছেলে, হয়ত লোকালয়ের কাছে এসে গেছি. ডেকে দেখি ছেলেটাকে।
এই ভাই শোন, শোন.
.... আচ্ছা ভাই রাজধানীতে যাওয়ার পথ কোনটি। আমি অস্ত্রগুরু দ্রোনের কাছে যাব।
ঐ ত, আর প্রহর খানেকের পথ. এই দিকে সোজা এগিয়ে যাও। পথেই দ্রোনাচার্য্যের আশ্রম পড়বে।
ঐ দূরে যে আশ্রমটা দেখা যাচ্ছে সম্ভবত: এটাই দ্রোনের আশ্রম। মনটা আজ আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। আমার এই কদিনের পরিশ্রম সার্থক।

ছোটদের পাতা

ছোট্ট নদীর তীরে

সিরাজুল ইসলাম (বয়স-১০)
গ্রাহক নং—৬২

ওই ছোট্ট নদীর তীরে
থাকত যদি আমার বাড়ি
গাছ-পালায় ঘিরে,
সেথা আমায় নিয়ে
সাঁঝ-সকালে গল্প করত
একটি ভালো টিয়ে ॥

সেই হনুমান

সুরজিত নন্দী (বয়স—১৪)

সেদিন শুক্রবার। ডেভিড কপারফিলডের মত সেই শুক্রবার সুখময় ছিল না, ছিল দুঃখময়। কিন্তু দুঃখময় না বলে বরং ভয়াবহ বলা ভাল। বন্ধুদের কাছে তা ভয়াবহ না মনে হয়ে হাসির মনে হতে পারে। কিন্তু তোমাদের কাছে যাই হোক না, আমার কাছে তা ভয়াবহ। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। ব্যাপারটা একটা হনুমানকে নিয়ে। আমরা জানি যে আমরাই শুধু অন্য কোন প্রাণী বা জন্তু জানোয়ারদের ভয় পাই না, তারাও রীতিমত আমাদের ভয় করে। কিন্তু সেই হনুমানটা ছিল, ঠিক তার উল্টো! বিন্দু-মাত্র মানুষদিগের ভয় পায় না।

তখন দুপুরবেলা। বৈশাখ মাসের তীব্র রোদে ছাদে চার রকমের আচার শুকোচ্ছে। হঠাৎ একটা হনুমানকে ছাদেতে লাফিয়ে পড়তে দেখে আমি আর আমার বোনেরা ছুটে গেলাম। দেখলাম হনুমানটা আচারের ওপরে দেওয়া জালের ঢাকনা সরিয়ে নির্বিঘ্নে এক টুকরো করে তুলছে আর শুঁকছে আর ফেলছে। হনুমানরা বোধহয় আচার খায় না, না হলে ফেলে দেবে কেন। তাই দেখে আমার ভীষণ রাগ হল। পাশ থেকে এক টুকরো ঢিল তুলে ছুঁড়লুম। হনুমানটা দাঁত বের করে একটা প্রতিবাদ করল। বিশেষ কিছু করল না। তারপর আবার পূর্বের ন্যায় আচার শুঁকে ফেলতে লাগল। আমি এবার বড় এক টুকরো ঢিল তুলে সেই হনুমানটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লুম। হনুমানটা হুপ্ করে একেবারে মুখের সামনে এসে বসল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সুন্দর একটা আছাড় খেলুম। আমার ধাক্কাতে বোনেরাও ধপাধপ্ পড়ল। যেন কে আগে সিঁড়িতে শুতে পারে তার কম্পিটিশন চলছে! হনুমানটা আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে নেমে আমাদের সিঁড়ি আগলে দাঁড়াল। আমরা তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করলুম। বাবা ছুটে এলেন। কি আশ্চর্য! বাবাকে দেখেই হনুমানটা এক লাফে হাপিস্।

"রং-নেই"

প্রথম
বিচিত্রা মুখার্জী-১৩
করিমগঞ্জ, বর্ধমান

আবিরে রাঙালো কে আমায়? পেছন ফিরে তাকাবার ফুসরত পেলাম না। আবার একমুঠো আবির আমার মুখে মাখিয়ে দিল। রাগ করার উপায় নেই। আজ আনন্দ উৎসবের মধ্যে রং বা আবির দিল বলে যারা রাগ করে তারা বোকা। আমি চেয়ে দেখলাম পাশের বাড়ির টুম্পা আমার চুলে, মাথায়, কপালে আবির দিয়ে বলছে—হোলি হ্যায়। টুম্পার বয়স বছর ১০, আমাকে দাদা দাদা বলে ডাকে। ভীষণ ভালবাসে! আমি ওকে কাছে ডেকে বল্লাম—এ্যাই দুষ্টু ছেলে...আমাকে আবির মাথায় দিলি কেনরে? আমি বড় না? পায়ে দিবি তো।

—না। ঠাকুরের পায়ে ছাড়া আর কারো পায়ে আমি আবির দিই না।

—ঠিক্ আছে....তুই এদিকে আয়। আমি তোকে একটু আবির দিয়ে দি।

টুম্পার হাত থেকেই আবির নিয়ে ওর কপালে মেখে দিলাম। তারপর ও বল্ল—আজ তোমার কাছে একটা আব্দার নিয়ে এসেছি বুলুদা।

—বল্।

—আমার বন্ধুকে তো তুমি চেন। সেই যে বাবলু ওদের বাড়ীতে একটু তুমি আমায় নিয়ে যাবে?

—কেন?

—ওর ভীষণ অসুখ, আমি দেখতে যাব বলেছি। মা-বাবা যেতে দিচ্ছেন না। বলে—ওর নাকি মায়ের দয়া হয়েছে। গেলে নাকি ছোঁয়া লাগবে। বুলুদা তুমি আমাকে নিয়ে চল না? জানো তো গতবারে আমি আর বাবলু কত মজা করে দোল খেলেছি। এবার ও বিছানায়। চল না।

আমি মিথ্যে কথা বলে টুম্পাকে কাটাতে চাইছিলাম। রাস্তাঘাটে যদি কেউ রং দিয়ে দেয়। কিন্তু

ও নাছোড়বান্দা। তাই বাধ্য হয়ে লুকিয়েই দুজনে গেলাম ওর বন্ধুর বাড়ী। আমার ঘরের ভেতর ঢুকতে সংকোচ হলেও টুম্পার কোন সংকোচ নেই। বাবলু ...বাবলু বলে ডাকতে ডাকতে বিছানার কাছে বসে পড়ে।

কিন্তু ঘরে ঢুকে আমি যা দেখলাম তাতে আমার কষ্টের সীমা রইল না। আজ দোলের দিন.... সবার চোখে যখন রং বেরং-এর ফাগুয়ার মেলা—তখন ছোট শিশুটি অর্থাৎ বাবলু রোগে আক্রান্ত হয়ে চোখ দুটো চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। ওর মা-বাবা টুম্পাকে জড়িয়ে কাঁদছে, আর বাবলু শীর্ণ গলায় বলছে—তুই কি রং-এর আবির এনেছিস্‌রে টুম্পা। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

টুম্পার দিকে তাকালাম। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা। হাতের আবির মাটিতে গড়াগড়ি। আমিও সেই মুহূর্তে ঐ আবিরের কোন রং দেখতে পেলাম না।

দোলের দিনের ব্যথা

দ্বিতীয়

অমিত কুমার দে (১৪)
ইউনিয়ন মেডিকেল স্টোর্স
দিনহাটা, কুচবিহার।

আজ তোমাদের গত বছরের দোলযাত্রার দিনে হওয়া আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা শোনাবো।

…সেদিন 'ফাগুয়া'। আকাশ, বাতাস, মাটি সব যেন রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। ঘন ঘন কানে আসছে আনন্দঘন রব—"হোলী হ্যায়"। আমিও কড়া তরল রঙ্ পিচ্‌কারীতে ভর্তি করে বেরিয়ে পড়েছি। আমার বন্ধু নিশীথ, তাপস, মান্না—সবাই এসে আমার সাথে মিলিত হল। তারপর আমাদের গ্রামের যত ঠাকুমা-ঠাকুর্দা রয়েছেন তাদের রাঙিয়ে দিতে শুরু করলাম। বড়দের পায়ে আবীর ছুঁইয়ে প্রণাম করলাম। বন্ধুদের সাথে কোলাকুলি করলাম।

চলতে চলতে আমরা গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। আমরা চেঁচিয়ে চলেছি—"ছারা রারা হু… হোলী হ্যায়'! তাই শুনে সাদা-ছেঁড়া জামা প্যান্ট পরা একটি ছোট ছেলে আমাদের দেখবার জন্য তার কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সংগে সংগে আমাদের পিচ্‌কারী থেকে রঙ্ ছুটে গিয়ে ওর ছেঁড়া শুভ্র পোষাকে রঙীন করে তুললো। তারপর ছেলেটি চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি বিস্মিত হলাম—সবাই আজকের দিনে খুশী হয়, কিন্তু এ কাঁদছে কেন? কাছে গিয়ে ওকে বললাম—"ভাই, কাঁদছো কেন?" ছেলেটি ভেজা গলায় বলল—"আমার এই একটাই জামা-প্যান্ট। তা তোমরা নষ্ট করে দিলে। আমি কি পরে আজ সন্ধ্যায় জলসা দেখতে যাবো?" আমার বুকটা দুঃখে ভরে উঠল।

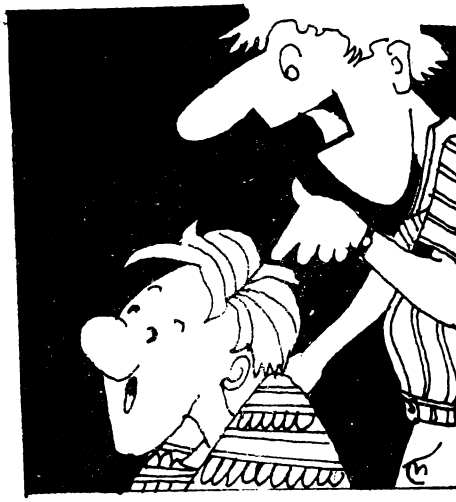

রামপড়ুয়া

গৌতম গলুই

সব কিছুতেই দক্ষ আমি
অঙ্কে শুধু ভয়।
ভূগোলটা যা একটু কড়া—
পাই ওটাতে ছয়!

ইতিহাসটা মুখস্থ জল
পড়ছি দিবারাত্র!
কেই না জানে বাবর ছিলেন—
হুমায়ুনের ছাত্র!

বাঙলা আমার ভালোই জানা
পদের প্রকার আটটা।
তবু কেন বড়দা এসে—
মারলো মাথায় গাঁট্টা?

কাঁচা ওজন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ভগীরথের বাড়ির সবার নাম একদম পুরাণ থেকে নেওয়া। সে নিজে ভাগচাষী। রেল স্টেশন থেকে পিচ রাস্তা চলে গেছে কো-অপারেটিভের মোড় দিয়ে সেখানে বাস থেকে নেমে ডান হাতে খানিকটা হাঁটলে নড়িদানা গাঁ। সেই গাঁয়ের ভেতর একটা পুকুরের পাড়ে ভগীরথের ভদ্রাসন। ওপরে গোলপাতা। নিচে মাটির দেওয়াল—বাঁশের খুঁটি। এরই লাগোয়া গোয়াল ঘর, ঢেঁকি ঘর, কয়েকটা নারকেল গাছ। পুকুরে কাঁটাশুদ্ধ বাবলা ডাল ডোবানো—পাছে চোর জাল টেনে মাছ নিয়ে যায়।

ওদের বাড়ির সামনের সুরকির রাস্তা দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন চলে গেছে এখানকার কলেজে। রসুল ডাঙায় যেমন স্কুল কলেজ হাসপাতাল আছে—তেমনি আছে ধানক্ষেত, আল, আলের ওপর কাঠের পুল, চার চাকার রিকসাভ্যান।

হাটবারে ওখানে পাকা কাঁঠাল ঘিরে নীল ডুমো ডুমো মাছি ভনভনায়। জোড়ায় জোড়ায় হালের বলদ বিক্রি হয়। পায়ের খুর আর মাড়ির দাঁত যাচাই করে চাষীরা কেনে।

এরই ভেতর ভগীরথের ছেলেমেয়েরা কাজে যায়। কানাই বড়। কলকাতার কোন্ ক্যান্টিনে কাজ করে। বলাই স্টেশন পেরিয়ে খালের ধারে মিত্তির বাড়ি ছাই ফেলে—হাঁস চরায়, খামারে যায়—চোদ্দ বছর বয়সে চোদ্দ টাকা মাইনে পায়। খড়-কুটোয়, গাইয়ের জাবনা দেয়। আবার গেরস্থ শরৎ মিত্তিরের কুচো বাচ্চা কোলে নিয়ে বলাই খাল পাড়ে দাঁড়ায়। গান গায়—আর কচি বাচ্চা ভোলায়। ও মনু—মনু—কাঁদে না—আমি তোমারে ফুল তুলে দেব। চাঁদ ধরে দেব। যা চাইবে—তাই দেব।

সে শরৎ মিত্তিরকে মামাবাবু বলে ডাকে। মিত্তির গিন্নীকে ডাকে মামীমা। মিত্তির গিন্নি বলাইয়ের নামে ব্যাংকে পাশ বই করে দিয়েছে, বলেছে—বলাই তুই তো ধান ভানিশ—চাল ব্যবসা করিস—সংসারে যা দিলি—তারপর যা থাকবে ব্যাংকে তুলে রাখবি। তোর অসময়ে কাজে লাগবে।

বলাই খুব পরিশ্রমী। সে সারা বাড়ির কাজ করে ফুরসৎ সময়ে ধানের ব্যবসা করে। শরৎ মিত্তিরকে গিয়ে বলে, মামাবাবু—এক বস্তা ধান ধার

দেও বাজার বরাবর দাম নিও।

সেই ধান নিয়ে সে আগান বাগানের কাঠকুটো জ্বেলে সেদ্ধ করে, রোদ উঠলে শুকোয়, পা দিয়ে পাল্টে পাল্টে দেয়। তারপর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধানটা ভাঙায়। চাল পায়, খুদ পায়, তুষ পায়, খুদকুড়ো সে তার পোষানী হাঁস মোরগদের খাওয়ায়। শরৎ মামার হাঁস মুরগীর সাথে সাথে বলাইয়ের হাঁস মুরগীগুলোও দলে মিশে বাড়ে—বড় হয়, ডিম দেয়, তায়ে বসিয়ে ছানা ফোটায় বলাই। এই করেও তার একটা বড় আয়, হাঁসগুলোকে সে খালের ঝিনুক তুলে তুলে খাওয়ায়, ঝিনুকের ভেতরকার মাংস খেয়ে খেয়ে হাঁসগুলো গাট্টাগোট্টা হয়। সেই হাঁস অনেক সময় হাটবারে গিয়ে বেচে দিয়ে আসে বলাই।

এই ভাবে তার দেড় হাজার টাকা জমে ব্যাংকে, সে টাকার দেমাকে মট মট করে হাঁটে। ভগীরথ বলে দে বাবা পাঁচশো টাকা দে—দশটা কাঠা জায়গা নেব।

না, দিত্তি পারবো না। দশ কাঠায় কি হবে এ্যাতো বড়ো সংসারে—

আবার ভগীরথ বলে, দে বাবা সাতশোটা টাকা দে, হালের বলদ কিনি এক জোড়া।

জমি কোথায় যে হাল দেবো?

ভাগে জমি পাবো।

ভাগের ধানের জন্যি সাতশোটা টাকা ঘর থেকে বের করে? তার চেয়ে হাল বলদও ভাগে জোগাড় করে নিও।

এবার একদিন বলাইয়ের বাবা মা একসঙ্গে এসে বসল, ও বাবা আমাদের—তোমার খুব দয়ার শরীল। এবার যে তোমার হাজারটা টাকা দিতে হয়।

কেন?

তোমার ছোটবোন আঙুরের বে।

ইদানীং মিত্তির বাড়ি থেকে বড় একটা নিজের বাড়ি যায় না বলাই। মামাবাবুর এখানে ইলেকট্রিক পাখা আছে, খাটাখাটুনীর পর সেখানেই পাখা ছেড়ে শুয়ে নেয় বলাই, আজ এখানে এসেছিল, নিজের বাড়ির গোয়ালের গায়ে বড় ঘরের কানাতে তার জায়গা। খেজুর পাতার দেওয়াল করে মাটির মেঝে-তেই একটুখানি আলাদা করা। সেখানে বাঁশের খুঁটির খোপে পাশ বইখানা রাখা যাবে। তাই নিতেই আসা।

নিত্তি এসে বলাই নিজেদের বাড়িটা বার বার নতুন করে দেখে, সে কোথায় থাকে—আর এ বাড়িটা কেমন, এখানেই তার জন্ম, এই তিন বছরে মিত্তির বাড়ি কাছ করতে গিয়ে তার জীবন পালটে গেছে। সে খুব গরমে পাখা ছেড়ে দিয়ে শোয়, আর এখানে গরমের রাতে ঘুম ভেঙে উঠে কতদিন নিশুতি রাতের উঠোনে জ্যোৎস্নাকে পড়ে থাকতে দেখেছে। গাই গরুর গায়ের মশা উড়ে এসে তখন তার গায়ে বসতো।

মা বাবাকে এক সঙ্গে টাকা চাইতে দেখে বলাই অবাক হয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে বললো, আঙুরের জন্যে ছেলে ঠিক করে ফেলেছো?

হুঁ, দ্বারিক পোতায় জমিজমা আছে, ছেলে এক-খানা সাইকেল চায়।

কি ভাবল বলাই, তারপর বলল, হাজার টাকায় হয়ে যাবে সব? আঙুরের শাড়ী—

সে কানাই দেবে, তোর টাকায় লোক খাওয়াবো, একখানা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সাইকেল কেনবো।

বলাইয়ের মনে পড়ে যাচ্ছিল—সে পিঠ বেঁকা করে চালের বস্তা নিয়ে বাজারে চলেছে, এক পালি চাল ছ'টাকা সত্তর পয়সা, ঠায় বসে থেকে বেচে বেচে তবে না ব্যাংকে টাকা জমালো। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যের মুখে মাঠের ঘাসের ডগায় যখন প্রজাপতি ডানা মেলে ভেসে ওঠে—তখনও ফুরসৎ পায় না বলাই। তখনও তার নিজের কাজ থাকে।

আঙুর তো বারো পেরুলো বাবা। কাহাতক পরের বাড়ি বাচ্চা রেখে জেবন কাটাবে—তোর টাকাটা পেলি বে হয়ে যায় মেয়েটার। তোদেরই তো বুন হয়।

মায়ের এ কথায় বলাই বললো, গাই বেচে মেয়ের বে দাও।

কি বলিস বাবা। ওই গাইয়ের দুধটুকু যোগান করে মাস কাবারে টাকা আসে—তাতেই তো এতবড় সংসারের মুদিখানা হয়।

আমি তো মিত্তির বাড়ি খাই থাকি। আমার আর সংসারে কি খরচা বল, দাদা শুধু বে-র শাড়িখানা দিয়ে খালাস ?

কানাইয়ের ক্যান্টিনের চাকরি নতুন বাবা। দেড়শো টাকার বেশী আগাম পাবে না। টাকা বলতি তো তোরই একার মজুদ টাকা।

বলাই শুনছিল—আর চোখে দেখতে পাচ্ছিল অন্য ছবি। তার ছোট বোন—আঙুর তার পিঠোপিঠি—বাড়ির ডোবাটার শেষ ধাপে নেমে এক কাড়ি বাসন মেজে তালের পৈঠা বেয়ে ওপরে উঠছে। সরু সরু পা। মাথায় তেল দেয় না কতদিন। গায়ের ফ্রকটা ছেঁড়া। এই বুঝি কাড়িখানেক কলাই বাসনের ভারে পা পিছলে পড়ে যায় আঙুর। তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বলাই বলল, চলো তাহলে ব্যাংকে, টাকাটা তুলে দি ব্যাংক থেকে।

এখন দিবি ? বাঃ। বেশ তো, তাহলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সাইকেলখানা আজই গোকুলের দোকান থে কিনে রং করাতি দেব। বলিছে—রিপেয়ার করে নতুন করে দেবে একদম।

টাকাটা তুলে সেই যে বলাই মিত্তির বাড়ির পুকুর পাড়ের বারান্দায় এসে শুয়েছে—আর ওঠার নাম নেই। মিত্তির গিন্নি ক'বার এসে ডেকে গেল। ও বলাই, উঠ্‌বিনি ? বেলা যে যায়—খেলিনে সারাদিন, শরীর খারাপ ?

বলাই গায়ে যেন জোর পাচ্ছিল না। কোনমতে চোখ খুলে দেখে বাবুর বাড়ির হাঁস মুরগীর সঙ্গে তার হাঁস মুরগীরাও মাঠে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের আটকানো দরকার। হয়তো কারো ধানক্ষেতে গিয়ে পড়বে। এভাবে ওদের ছাড়া থাকার কথাও নয়। সন্ধ্যের মুখে শেয়াল এসে দু'একটা নিয়ে যেতে পারে। সারাদিনে এই সময়টায় তার সামান্য ফুসরৎ থাকে। আজ আর এখন তার কোন কাজ করতে ইচ্ছে হল না। হাঁস মুরগীগুলো হেলে দুলে চলেছেই তো চলেছে। একদম মাঠের শেষে চলে পড়া মেঘে গিয়ে উঠবে না তো।

মিত্তির গিন্নি আবার বললো, অবেলায় ঘুমোসনি বাবা, ওঠ, খেয়ে নে—

ক্ষিদে নেই মামীমা। আচ্ছা মামীমা—হাজার টাকার ওজন কত ?

মিত্তির গিন্নি নিজের থেকে ঘরে যেতে যেতে জানতে চাইল, কাঁচা টাকা ? না, নোট ? কেন ?

এমনি। নোটই বেশীর ভাগ। দু'চারটে কাঁচা টাকা ছিল বোধহয়। বাবারে দিলাম—

তাহলি আর ওজন কি এমন। কিন্তু হাজার টাকা দিয়ে দিলি ভগীরথরে। ওতো একটি পয়লা নম্বরের অপদার্থ। কি করবে হাজার টাকা দিয়ে ?

—আঙুরের বে।

—অতটুকু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস তোরা ?

আমাদের নিয়ম যে মামীমা—। বলে মনে মনেই ভাবতে গেল বলাই – আসলে ক'টা কাঁচা টাকা ছিল, সাত আটটা। বাকি তো সব নোট ছিল। এই তিনশো সাড়ে তিনশো গ্রামের মত কাঁচা টাকা ছিল মোট। এক জায়গায় ঢিবলি করলে এই অ্যাত্তোটা।

উঠে বসলো বলাই। হাঁস মুরগীগুলো ঘোরাতে হবে। শুকোতে দেওয়া এক বস্তা ধান তোলা দরকার ছাদ থেকে। এ সবের ভেতর টাকার কাঁচা ওজনটা সে ভুলতে পারছিল না। এই প্রথম ব্যাংকে তার টাকা রাখা।

বলাই জানে সদ্য কাটা ধান মাপার সময়েও একটা কাঁচা ওজন ধরা হয় পাল্লায়। শেষে সেটা ধলতা হিসেবে বাদ দিতে হয়।

(২০ পাতার পর)

আনন্দের আতিশয্যে ভূতনাথের সব কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। সে বলল, তুমি আমায় এমন কিছু দিতে পার যা আমার কাছে থাকলে সবাই আমাকে ভালবাসবে, আর যেন কেউ আমাকে বোকা না বলতে পারে।

লোকটি মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারি। বলেই সে তার পাগড়ীর ভেতর থেকে চক্‌চকে একটা মোহর বার করে ভূতনাথের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও, এই মোহরটা তোমার কাছে রাখ। এটা যতদিন তোমার কাছে থাকবে ততদিন সবাই তোমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসবে, কেউ তোমাকে আর বোকা বলবে না। কিন্তু খবরদার, এ মোহর যেন কখনো মাটিতে না পড়ে তাহলেই কিন্তু বিপদ হবে।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি মোহরটা নিয়ে তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে গেল। ঢোকাতে গিয়েই অসাবধানে মোহরটা গেল মাটিতে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মোহরটা একটা বিষাক্ত সাপ হয়ে তেড়ে এল ভূতনাথের দিকে। তাই দেখে লোকটি মুহূর্তের মধ্যে তার হাতের মুঠোয় ধরে ফেলল সাপটাকে। ভূতনাথ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, সাপটা অমনি আবার সেই মোহর হয়ে গেল। মোহরটা আবার ভূতনাথের হাতে দিয়ে লোকটি বলল, এত অসাবধান হলে কি চলে? নাও, এটা রেখে দাও। যদি কখনো এই রকম অঘটন ঘটে সঙ্গে সঙ্গে মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে সাপটার দিকে ছুঁড়ে দেবে, তাহলেই সে আবার মোহর হয়ে যাবে।

ভূতনাথ ভয়ে ভয়ে মোহরটা নিয়ে পকেটে পুরে রাখল। তারপর কৌতূহলের সুরে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? এখানে তুমি কি কর? একটু আগে সিংহাসনে যে বসেছিল সে-ই বা কে?

লোকটি অমনি হি-হি করে এক বীভৎস হাসি হেসে বলল, সে কি কথা, তুমি আমাদের কাউকেই চেন না? উনি হলেন আমাদের নবাব কতলু খাঁ। আর আমি হলাম নবাবের খাস খানসামা। আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে নবাব এই মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। এই মসজিদ ছিল নবাবের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। তাই নবাব এই মসজিদকে কোনদিন ছেড়ে যেতে পারেন নি। আর আমি হলাম নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাই আমাকেও সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়।

ব্যাপারটা আর বুঝতে বাকি রইল না ভূতনাথের। তার সারা শরীর আতংকে শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে গেল, কিন্তু মনে হল কে যেন তার পা দুটো দু'হাতে টেনে ধরেছে। ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকালো। কিন্তু কই, কেউ তো নেই। ফাঁকা ঘর পড়ে আছে, সেই লোকটাও নেই সেখানে। হঠাৎ কে যেন তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলে উঠল, কি ভূতনাথ, ভয় পেয়েছ নাকি? ভয় নেই, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না।

ভূতনাথ এদিক ওদিক তাকালো, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। তবে কেউ যে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। বুঝতে পেরেই আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। মুহূর্তে তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল— জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

তার পরের কথা আর কিছুই মনে নেই ভূতনাথের। শুধু যখন জ্ঞান ফিরল সে চোখ মেলে দেখল ভোর হয়ে গেছে, আর মসজিদের দরজার সামনে মাটিতে সে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্যান্টের পকেটে হাত গলিয়ে সে দেখল সত্যিই একটা চক্‌চকে মোহর রয়েছে। কিন্তু কোথায় বা সেই রাজা আর তার খানসামা, কোথায় বা সেই সিংহাসন আর স্বর্গের মত সাজানো ঘর, কিছুই নেই। চোখের সামনে শুধু ভাঙা মসজিদ আর বড় বড় গাছের ঝুরি। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন স্বপ্নের মত মনে হল। আর এক মুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা না করে ভূতনাথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

অনেক খোঁজার পর যখন সে বাড়ি পৌঁছল, অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বাড়ির সকলেই তার জন্যে উদগ্রীব, কেউ আর এক মুহূর্তের জন্যে তাকে কাছ-ছাড়া করতে চাইছে না। জীবনে কারুর কাছ থেকে এত ভালবাসা আর আদর সে আর কখনো পায়নি। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকল।

দিনাঙ্গারার রহস্য

শিশিরকুমার মজুমদার

রহস্যময় চুরি

প্রশান্ত অনেক ভেবে দেখেছে, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তা ও একদম বুঝতেই পারেনি। তবে একথা ঠিক, সবাই কি যেন গোপন করছে! সবাই মানে, ওর জ্যাঠামশাই আর পিসী। ঘটনা যে কিছু আছে তাতে সন্দেহ নেই। আর তাও নিশ্চয়ই বেশ গুরুতর তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা এমনই ঘটনা যার কথা কেউই ওকে বলতে চাইছে না।

প্রশান্ত থাকে ওর জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। যখন খুব ছোট ছিল ও অসুখে ওর বাবা মা দুজনেই মারা যান। তাঁদের কথা একদম মনে নেই প্রশান্তর। দেওয়ালে টাঙান ছোট ছোট দুটো ছবিকেই ও জানে ওর বাবা মার ছবি বলে। ওরই ঘরে টাঙান আছে ছবি দুটো। সত্যি বলতে কি কখনও খুব ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি ও ছবি দুটোকে। ও চেনে ওর জ্যাঠামশাইকে। তিনি সরকারি বড় অফিসার ছিলেন। এখন রিটায়ার করে এই দূর গ্রাম বিষ্ণুপুরে জমি জায়গা কিনে বাড়ি বানিয়ে চাষবাসে মন দিয়েছেন।

ওদের বাড়ির চারপাশ ঘিরে সুন্দর বাগান। সে বাগানও ওর জেঠুর হাতে তৈরী। বাগান দেখাশোনা করে অবশ্য রাখো মালী। তার দুজন এ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। ছোট জনের নাম বকুল। নেহাতই দেহাতী তার সঙ্গেই প্রশান্তর খুব ভাব।

জেঠু ওকে খুবই ভালবাসেন। বিয়ে করেন নি তিনি। প্রশান্ত ছাড়া আপন বলতে তার এক ছোট বোন আছেন। তিনিই প্রশান্তর পিসী। তবে তিনি থাকেন কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সেখানে পিসেমশাই কি যেন কাজ করেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা এখনও প্রশান্তর মতই স্কুলে পড়ে।

বিষ্ণুপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ে প্রশান্ত ক্লাস ইলেভেনে। সকাল বিকাল বাগানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জেঠু নিজেই প্রশান্তর পড়াশুনার তদারকি করেন। তাই স্কুলে প্রশান্তর ভাল ছাত্র বলেই নাম।

গোলমালের সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। কলকাতা থেকে বিকালের গাড়ীতে পিসী একদিন হঠাৎ এসে হাজির হলেন। এমন কখনও হয় না। চিঠি লিখে খবর দিয়েই আসেন উনি। যখন এখানে এসে থাকেন, তখন বেশ আনন্দে দিন কাটে প্রশান্তর। চমৎকার রান্না করতে পারেন উনি। তাছাড়া যা গল্প বলতে পারেন, তার তুলনা নেই। এখানে প্রশান্তর সঙ্গেই তার সব থেকে বেশী ভাব। এলে ওকে নিয়েই সময় কাটে তার।

এবারে কিন্তু সবকিছু একেবারে গোলমাল হয়ে গেল। চিঠি না লিখে তিনি এলেন একা। পৌঁছালেন সন্ধ্যার গাড়ীতে। বাড়িতে পৌঁছে হাতের থলিটা ঘরের ভেতরের টেবিলের উপরে রেখেই সোজা জেঠুর

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। একবারও ফিরে তাকালেন না প্রশান্তর দিকে।

আধ ঘণ্টা বাদে দরজা খুলে বের হলেন যখন, তখন তাঁর মুখ থমথম করছে। জেঠুও যেন কেমন গম্ভীর।

রাখো মালী এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বড় দিদিমণি খবর সব ভাল তো?'

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পিসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাতে বাগানের সব ফটক বন্ধ থাকে তো রাখো?'

উত্তরে অবাক রাখো বলল, 'হ্যাঁ বড় দিদিমণি থাকে।'

'এখন থেকে দিনেও তা বন্ধ রাখবে। জিজ্ঞাসা না করে কেউ যেন আর এ বাড়িতে ঢুকতে না পারে।' বললেন পিসী, 'বুঝলে?'

মাথা নাড়ল রাখো। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এমন করতে বলছ কেন বড় দিদিমণি, এই দেশ গাঁ জায়গায় চোর ডাকাতের তো ভয় নেই।'

জেঠু বাধা দিয়ে বললেন, 'আঃ অত বাড়াবাড়ি করিস না সদু। তুমি যাও রাখো, তবে সজাগ থেকো।'

রাখো চলে গেল। অবাক হল প্রশান্ত, এ কি হল পিসীর হঠাৎ? এমন তো উনি কখনও করেন না। আর হঠাৎ সব কিছু থাকতে উনি বাগানের ফটক নিয়ে পড়লেন কেন? কিছু ভেবে ঠিক করার আগেই ঘরের ভিতর থেকে পিসী ওকে ডাক দিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'আর তোকেও বলি প্রশান্ত, বাড়ি থেকে যখন তখন হুট করে বের হবি না। হোক সে এ দেশ পাড়া গাঁ। বদলোক সব জায়গাতেই আছে। স্কুলে এখন থেকে কারও সঙ্গে যাবি। কখন ছুটি হবে তা আগেই তাকে বলে দিবি, যে কেউ গিয়ে তোকে নিয়ে আসবে। পথে যার তার সঙ্গে কথা বলবি না। কারও দেওয়া কিছু কখনও ভুলেও খাবি না। হাঁ করে কি ভাবছিস? যা বলছি তা কানে যাচ্ছে তো? সব কিছু মেনে চলবি।

জেঠু বললেন, 'তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। না না, তুই ভয় পাস না শন্তু। তবে দিনকাল ভাল নয়! সাবধানে চলাচল করবি। যা এখন খেলতে।'

খেলার মাঠের দিকে যেতে যেতে প্রশান্ত পিসীর কথাই ভাবল। ওঁর এমন করার মানে কি? এতো ঠিক, উনি কিছুতে বেশ ভয় পেয়েছেন! কিন্তু তা কি হতে পারে? কিছুই ভেবে পেল না প্রশান্ত।

রাতে একটা ব্যাপারে ও ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তেষ্টায় ঘুম ভেঙে যাওয়াতে উঠেছিল জল খেতে, জানলা দিয়ে দেখতে পেল, ভিতর বাড়ির উঠানে জেঠু আগুন জ্বেলে কি সব পোড়াচ্ছেন। পাশেই পিসী দাঁড়িয়ে। জিনিসগুলো যে কাগজ তা বুঝল প্রশান্ত। কিন্তু এমন করে লুকিয়ে কেন তা পোড়াচ্ছেন জেঠু! কার কাছ থেকে এ ব্যাপারটা লুকোচ্ছেন উনি?

আগুন নিভে গেলে জেঠু বললেন, 'বুঝলি সদু, কোন চিহ্নই আর রাখা উচিত নয়। কি জানি কি থেকে কি হয়। তুই ঠিক বলেছিস, ওর ভবিষ্যতই এখন আমাদের ভাবতে হবে। সব চিহ্নই তাই এমনি করে মুছে ফেলব। তারপর যা হবার হবে। আইন কিন্তু ওদের দিকে। ইচ্ছা করলে তার সাহায্য ওরা নিতে পারে।' পিসী বললেন, 'আইন টাইন বুঝি না দাদা। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই চলব আমরা। খবর পেলাম দিন পাঁচেক আগে ছাড়া পেয়েছে তারা। ছাড়া পেয়েই সোজা গেছে দেশে। এবারে হয়ত এখানে এসে হাজির হবে। গোলমালতো তখনই পাকাবে। তাই এত সাবধান হতে বলছি। এখন দেখ কি হয়।'

দুজনেই নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। একটু দেখে আস্তে দরজা খুলে প্রশান্তও উঠানে নেমে পড়ল। ছাই-এর গাদার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, যা ভেবেছে ঠিক তাই। জেঠু কিছু কাগজ পুড়িয়েছেন। বেশী-গুলোই চিঠি, কটা তার পোস্ট কার্ডে লেখা। নীচু হয়ে দেখল, দু-চারটে আধপোড়া লেখার টুকরো তখনও পড়া যাচ্ছে। কি লেখা ছিল চিঠিগুলোতে? নীচু হয়ে বেছে বেছে গোটা চারেক পোড়া টুকরো ও তুলে নিল। ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে পড়বে ভাবল। ঠিক তখনই পেছনের জানলা থেকে জেঠুর গলা শুনতে পেল, 'ওখানে কি করছিস তুই এত রাতে?'

পোড়া টুকরোগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে প্রশান্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে কে আগুন জ্বালিয়ে ছিল জেঠু।'

'ও তো আমি জ্বালিয়ে ছিলাম, কিছু পুরণো কাগজ পুড়িয়েছি। ও কিছু না। যা শুয়ে পড় গিয়ে।' যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবেই কথাগুলো বললেন জেঠু।

নিজের ঘরে ফিরে গেল প্রশান্ত। তখনি আলো জ্বালতে আর ওর সাহস হল না! কি জানি যদি জেঠু এসে পড়েন। টেবিলের ড্রয়ারে পোড়া টুকরো-গুলো নামিয়ে রেখে ও হাত ঝেড়ে শুয়েই পড়ল। সকালেই দেখবে কি লেখা আছে ওতে। শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম ভাঙল পিসীর ডাকাডাকিতে, 'ওঠ ওঠ এতো ঘুমোতেও পারিস।'

চোখ কচলে উঠে বসল প্রশান্ত। পিসী সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন, 'তোকে না কতবার বলেছি বাগানের দিকের জানালাটা বন্ধ করে শুবি। তা কে শোনে কার কথা! আর দাদারও বুদ্ধির বলিহারী যাই, বাড়ি করেছে তো কোন জানলায় গরাদ দেয়নি। হবে যেদিন চুরি তো বুঝবে। নে ওঠ আর শুয়ে থাকিস না। মুখে চোখে জল দে। ভোর ভোর বিষ্ণু মন্দিরে পুজো দিতে যাব। সঙ্গে যাবি তুই।'

বিছানা থেকে নেমে প্রশান্ত বলল, পিসী জানলা তো আমি খুলে শুইনি। ও জানলাটা তো কখনও খোলাই হয় না। কে খুলল ?'

'কি বলছিস তুই ? জানলাটা কখনও খোলা হত না ? আরে, হাঁ করে তাকিয়ে রইলি কেন, দেখ দেখ কিছু কোথাও চুরি গেল না কি ?'

পিসীর চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এল। চারদিক তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। না, কোথাও কিছু চুরি যায়নি। তবে চোর যে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাগানে জানলার নীচের নরম মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজে পেল রাখো মালী। বহুদিনের পুরণো রাঁধুনী মোহনদাও ঘরের আনাচে কানাচে কাদামাখা পায়ের ছাপ খুঁজে পেল। জুতো পরে চোর এসেছিল জানলা দিয়ে ভিতরে। জানলার চৌকাঠে অল্প কাদা লেগে আছে তাই। আর অবাক কাণ্ড চোরের জুতোর মাপ ঠিক জেঠুর জুতোর মাপের মত। তবে কি চেনা চোর জেঠুর জুতো চুরি করে পরে জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল।

কিন্তু এত কষ্ট করে চোর যদি ঢুকলই বাড়িতে তো কিছু চুরি করে নিল না কেন ? এ রহস্যের আর সমাধান হল না। পিসী পুলিশ ডাকতে বললেন, জেঠু রাজী হলেন না। বললেন, 'যখন কিছুই চুরি হয়নি তখন আর হাঙ্গামা করে লাভ কি ?'

হাঙ্গামা মিটলে চা জলখাবার খেল সবাই। পিসীর আর মন্দিরে যাওয়া হল না। তিনি পাশের চক্রবর্ত্তী বাবুদের বাড়ীতে গেলেন। জেঠু গেলেন বাগানে গোলাপ চারাগুলোর তদারক করতে। নিজের ঘরে ফিরেই প্রশান্ত পোড়া চিঠির টুকরোগুলো নিয়ে বসল। টুকরোগুলো টেবিলের ওপরে বিছিয়ে ম্যাগনি ফাইং গ্ল্যাসটা ধরতেই প্রথম টুকরোতে লেখা দেখল, '...অবিনাশের কাজ সন্দেহজনক মনে...।' দ্বিতীয় টুকরোতে লেখা '...ইলা মাঝিও দলে...; তৃতীয় টুকরোতে লেখা, '...প্রণত প্রতাপ....।' চমকে উঠল প্রশান্ত, প্রতাপ নামটা যেন ওর খুবই চেনা নাম! কিন্তু কার নাম ওটা ? অবিনাশ তো পিসেমশাইয়ের নাম। তিনি এখন কলকাতায় থাকেন। কিন্তু প্রতাপ কে ? তাকে তো কখনও দেখেছে বলে প্রশান্তর মনে পড়ল না। অথচ নামটা এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন ওর! তবে তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর চিঠি কেন জেঠু অমনভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করলেন!

প্রশান্ত জানে ওর বাবার নাম পার্বতী চরণ রায় চৌধুরী। কিন্তু জেঠুর নাম প্রবীর চন্দ্র, ওর নিজের নাম প্রশান্ত চন্দ্র, ঠাকুর্দা ছিলেন প্রমথ চন্দ্র। বাড়ির সবার নামই যখন "প্র" দিয়ে তখন কেন ওর বাবার নাম হঠাৎ অমন বিদঘুটে হল। ওর বাবার নামই তো প্রতাপ চন্দ্র হতে পারত। তাহলেই তো চিঠির রহস্য আর থাকত না। কিন্তু তা আর হবার উপায় নেই। এদেশেও অন্য সব দেশের রেওয়াজ, সংসারে কোনও মৃত্যু ঘটলে, মৃতের স্মৃতি জড়িত সব কিছুই যত্ন করে রেখে দেওয়ার। ওর বাবা মা দুজনেই মারা গেছেন। এ চিঠিগুলো ওর বাবার হলে কখনও জেঠু অমন করে পোড়াতেন না। তাছাড়া জেঠু তো কোন দিনও বলেন নি যে ওর বাবার লেখা চিঠি ওর কাছে আছে। তার মানে পোড়ান চিঠিগুলো সবই অন্য কোনও লোকের।

বাবার কথা মনে হতেই মুখ তুলে প্রশান্ত তাকাল

উঁচু দেওয়ালের দিকে। যেখানে পাশাপাশি ওর বাবা-মার দুখানা ছবি ঝুলছে। তাকিয়েই চমকে উঠল প্রশান্ত, এ কি, দেওয়াল শূন্য কেন? ছবি দুটোর কোনটাই ওখানে নেই। দেওয়ালের গায়ে শুধু ছবির মত দাগ আঁকা রয়েছে ধুলোর। ছবি কি হল? চোরে কি তবে ছবি দুটোই চুরি করে নিয়ে গিয়েছে?

তাড়াতাড়ি পোড়া চিঠির টুকরোগুলো ও আবার তুলে রাখতে গেল ড্রয়ারে। অমনি নজরে পড়ল, শেষ টুকরোটাতে লেখা আছে, দিনাজারা, বিহার। ৩-৮-…, তাহলে এটা একটা ঠিকানা, সঙ্গে তারিখ দেওয়া।

টুকরোগুলো ড্রয়ারে ফেলে ছুটে ও বার হয়ে গেল বাগানে জেঠুর কাছে। ওকে অমন করে ছুটে আসতে দেখে জেঠু উঠে দাঁড়ালেন, ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি সন্তু? অমন করে ছুটে আসছিস যে?' 'ছবি দুটোই চুরি গিয়েছে জেঠু।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল প্রশান্ত।

'ছবি? কোন্ ছবি, কার ছবি?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন জেঠু। 'বাবা আর মার ছবি! ও দুটোই দেওয়ালে নেই!'

'কি যা তা বলছিস তুই। ও ছবি চুরি করে কার কি লাভ?'

'তা জানি না, তবে ও দুটোই চুরি গিয়েছে। দেখবে চল।'

ধুলো-মাটির হাত ঝেড়ে জেঠু বললেন, 'চল তো দেখি।—কি দেখতে কি দেখেছিস, চোরে কষ্ট করে দুটো ছবি চুরি করবে কেন?

ঘরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে জেঠুও অবাক হলেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। তারপর যেন আপন মনেই বললেন, 'কে এমন কাজ করল? সে যে কি সর্বনাশ করল আমাদের, তা আর বলার নয়। প্রশান্ত, তোর বাবা আর মার অন্য কোনও ছবি এ বাড়িতে নেই। যতদূর জানি, আমাদের আত্মীয় বন্ধুদেরও কাছে নেই। চোরে সামান্য দুটো টাকার লোভে এ কি করল বল তো।' দুঃখে দুহাতে মুখ লুকালেন জেঠু।

বাবা-মার কথা মনেই নেই প্রশান্তর, শুনেছে ও ওর যখন তিন বছর বয়স, তখনই তাঁরা অসুখে মারা

যান পরপর অল্প ক'দিনের মধ্যেই। প্রথম ক'দিন ও নাকি খুব কেঁদেছিল, তারপর পিসি আর জেঠুকে পেয়েই বাবা-মার কথা একদম ভুলে যায়। ফটো দুটো ওর ঘরে টাঙান থাকলেও, ও এখনও মনে মনে ওর বাবা-মার মুখের ছবির কথা ভাবতে পারে না। আর ছবি দুটো হারিয়ে গেছে বলে ওর মনে সত্যি তেমন কোন দুঃখ হয়নি। এমন কি বাড়িতে আর অন্য কোনও ছবি নেই বলেও এতটুকু দুঃখ নেই ওর। তবে চোরে কেন বাড়ির মধ্যে ঢুকে চুরি করবে? তা সে যাই হোক না কেন, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

তাই প্রশান্ত বলল, 'থানায় খবর দি জেঠু। ও ছবি কে কিনবে এই দেশে গাঁয়ে। বোকা চোরটা ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

'থানা?' মুখ তুলে তাকালেন জেঠু,—এর জন্য তুমি থানায় যেতে চাইছ? তা হ্যাঁ, একবার তো খবর দেওয়া উচিত। দারোগা আসুন, দেখুন সব কিছু, তারপর যা করার করুক।'

খবর শুনে পিসিমা এসে বললেন, 'কি, থানা পুলিশ! তুমি ক্ষেপেছো দাদা? সামান্য দুখানা ছবি, ওর জন্য অত হাঙ্গামা করতে হবে না। কলকাতায় আমার কাছে ও ছবি আছে। খুঁজে পাঠিয়ে দেব।

জেঠু তবু বললেন, 'তা বলে চোরকে ছেড়ে দেব ?'

'ওসব না করে ঘরের জানলায় লোহার গরাদ লাগাবার ব্যবস্থা করতো। বললেন পিসি, 'তাতে ঢের বেশী কাজ হবে। চোর যখন পথ খুঁজে পেয়েছে, তখন আজ দু'খানা সামান্য ছবি নিয়ে খুশি হলেও কাল কি করবে তা ভাবতে পারছ ? তাড়াতাড়ি মিস্ত্রি ডেকে ব্যবস্থা কর।'

ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু দুদিন পরে যা ঘটল তাতে ভীষণ চিন্তায় পড়ল প্রশান্ত।

২

একটা উড়ো চিঠি

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিল ও। তাড়াতাড়ি মাঠে যেতে হবে, বিকেলে টাউন ক্লাবের সঙ্গে স্কুলের ফুট-বল ম্যাচ। ও খেলবে না, খেলা দেখবে। খেলবে ওর বন্ধু কালু। স্কুলের রাস্তা ছেড়ে বাড়ির পথের বাঁকে এসে ও থমকে দাঁড়াল। খোঁচা খোঁচা লম্বা এক মুখ দাঁড়ি গোঁফে ভরা একজন মাঝ বয়সী লোক ওর পথ আগলে দাঁড়াল। পরণে তার আধময়লা জামা কাপড়, দেখলেই মনে হয় বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। দাড়ি গোঁফে ভরা মুখ এমনই যে, লোকটাকে কেমন দেখতে আসলে তা বোঝার উপায় নেই। এমনি তো দেখলে বেশ ভয়ই হয়। লোকটা শান্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি প্রশান্ত রায় চৌধুরী ?

—হ্যাঁ। ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল প্রশান্ত।

'প্রবীর রায় চৌধুরী তোমার জ্যাঠামশাই ?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো ? সাহস করে জিজ্ঞাসা করল প্রশান্ত।

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি। স্কুল থেকে ফিরছ ?

বেশ রাগই হল প্রশান্তর। হাতে বই–খাতা, এসব দেখেও কি লোকটা বুঝল না ও কোথা থেকে আসছে। ও কোনও উত্তর দেবার আগেই লোকটা ফের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ক্লাসে পড় বাবা ?

ওর কথায় কেমন যেন ভাব। ঠিক রাগ করা যায় না তাই। রাগ চেপেই তাই বলল প্রশান্ত, 'ক্লাশ ইলেভেনে, সামনে পরীক্ষা। কিন্তু এসব কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? আপনি কে ? থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল প্রশান্ত।

—'আমি কেউ নই বাবা।' কেমন ভাবে যেন বলল লোকটা। 'যাও বাড়ি যাও।' কথার শেষে পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেল ও স্টেশনের দিকে। একবারও আর পিছন ফিরে তাকাল না।

লোকটাকে প্রথমে খারাপ বলেই ভেবেছিল প্রশান্ত কিন্তু ওর ক্লান্ত, শান্ত অসহায় গলার স্বর শুনে কেন যেন মনে আর কোনও ভয় বা রাগ রইলো না। মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই খুব দুঃখি। কিন্তু কে ও ? ওর সম্বন্ধে এত কথাই বা জানতে চাইল কেন ?

খেলার মাঠে ভাল করে খেলায় মন দিতে পারল না ও। বারবার লোকটার কথাই মনে হতে লাগল। মনে হল পিসির কথা, তিনি তো ওকে সাবধান করে দিয়েছেন যার তার সঙ্গে কথা না বলতে। তবে কি এই লোকটাই সে আজে বাজে লোক! কিন্তু একে তো পিসি কখনও দেখেন নি। তবে?

খেলার মাঝে হঠাৎ ওর বন্ধু কানুর খুব চোট লেগে গেল। ব্যস্ সব কথা ভুলে ও বন্ধুকে নিয়েই পড়ল। রিক্সা ডেকে বন্ধুকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেল। সেখান থেকে বন্ধুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যখন ও বাড়ির কাছে পৌঁছেছে, তখনি কিন্তু আবার লোকটার কথা ওর মনে পড়ল। সত্যি, লোকটা বড় অদ্ভুত ধরণের! ভাবতে ভাবতে গেট পার হয়ে জেঠুর বসার ঘরের সামনে গিয়ে ওর পা দুটো আটকে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল। টেবিলের সামনে বসে ছিলেন জেঠু। কিন্তু তাঁর সামনে দরজার দিকে পিছন করে কে দাঁড়িয়ে? তার জামা কাপড় তো ঠিক লোকটার মতই। মাথার চুলগুলোও তেমনি উস্কোখুস্কো। জেঠুর মুখে চোখে কেমন যেন ভাব। তাতে, ভয় দুঃখ ব্যথা সবই যেন মেশান। স্পষ্ট শুনতে পেল প্রশান্ত, জেঠু বললেন, 'আইন তোমাকে সে অধিকার দিয়েছে জানি। কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা? তোমার আমার জীবন তো শেষ হতে চলল, কিন্তু যার জীবনের যাত্রা আরম্ভ হচ্ছে, ভাবতে হবে তার কথা। সে কথা কি ভেবেছ? চির জীবন কেউ অপমানের বোঝা বয়ে মাথা হেঁট করে থাকুক, এত কাণ্ডের পরেও কি তুমি তাই চাও? যা করবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বুঝে করবে।'

লোকটা বলল আমার কথা কি বিশ্বাস করেন না?

'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আজ আর কিছুই এসে যায় না।' বললেন জেঠু, 'বিশব সংসার কি বিশ্বাস করে সেটাই হল কথা। তারা প্রমাণ চায়, প্রমাণ। এত কাণ্ডের পর, বোঝই তো সে প্রমান হতে হবে চোখে আঙুল দেওয়া প্রমাণ। সে প্রমান কি আছে তোমার কাছে? নেই। তবে?'

'আমাকে সময় দিলে সে প্রমাণ হয়ত আমি করতে পারব।'

'বেশ, তা হলে সেই প্রমাণ নিয়েই তুমি এসো। তাহলে। তার আগে যেমন চলছে তেমনই চলুক। সেটাই সবার পক্ষে মঙ্গল হবে বলে আমি মনে করি।

একথা শুনেও লোকটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে জেঠু বললেন, 'বললাম তো, আমাদের অনেক বয়স হয়েছে, এখন সবকিছু থেকে সরে দাঁড়াবার সময়ও তো হল। তোমার যখন যাবার জায়গা আছে, তখন সেখানেই চলে যাও। প্রমাণ পেলে এসো না হয়। তখন বাধা দেব না। তার আগে সবকিছু আবার আগের মতই স্বাভাবিক ভাবে চলুক।' জেঠুর কথাগুলো যেন কেমন দুঃখে ভরা।

লোকটা কে? এসব কি হেঁয়ালী কথা বলছেন জেঠু। এসবের মানেই বা কি? কিছুই বুঝতে পারল না প্রশান্ত। চুপি চুপি দরজাটা পার হয়ে পাশের জানালার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ও। সামনে তাকিয়ে দেখে ও অবাক হল না। হ্যাঁ, সেই লোকটাই জেঠুর সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ খেয়াল হল ওর, দরজার আড়ালে ও একা দাঁড়িয়ে নেই, আবছা অন্ধকারে আরও একজন যে দাঁড়িয়ে আছে, সে হল পিসি পিসির দু'চোখ অল্প আলোতেও চিকচিক করছে। পিসির চোখে জল! অবাক প্রশান্ত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাঁদছ পিসি?'

পিসী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বললেন, 'না-রে, হঠাৎ চোখে কি যেন পড়ল।'

'ও লোকটা কে পিসী?' জিজ্ঞাসা করল প্রশান্ত।

'ও লোকটা কে তা আমি জানব কেমন করে?' কেমন যেন ধরা গলায় বললেন পিসী।

এ কথা শুনে কেন যেন মনে হল প্রশান্তর, পিসীও যেন কিছু লুকোচ্ছেন।

ঘরে জেঠু হঠাৎ বললেন, 'যা করার তাড়াতাড়ি কর। বাড়িতে এখন শন্ত নেই। ওর আসার সময় কিন্তু অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আশা করি ওর সামনে তুমি আর কোনও নাটক সৃষ্টি করবে না।

একথা শুনে লোকটা বলল, 'আপনার সব কথা তো আমি বুঝলাম। কিন্তু এতদিন বাদে বাইরের জগতের মাঝে ফিরে এসে আর একজন যে কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। ফিরে গিয়ে তাকে

কি বোঝাব আপনি বলতে পারেন ?'

'বলবে, একজনের মঙ্গলের কথা ভেবেই তাকে চুপ করে থাকতে হবে। যতদিন না তোমার ওই সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ না পাওয়া গেলে, যে ছিল না, যে নেই ওর জীবনে, সে আর ফিরে আসবে না। এই আমার শেষ কথা।'

এরপর আর কোন কথাই বলতে পারল না লোকটা। মুখ তুলে আর তাকাতেও পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ পিছন ফিরে দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিসী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্পষ্ট দেখেছে প্রশান্ত, লোকটারও দুচোখ আলোয় চিক্ চিক্ করছিল। কেন যেন ভীষণ রাগ হল ওর জেঠুর উপরে। কি চাই—ছিল লোকটা ? কে জানে! তা দিয়ে দিলেই তো পারতো জেঠু। কি এমন ক্ষতি হত তাতে ? লোকটা কত খুশি হত।

কিন্তু এসব কি হচ্ছে এ বাড়ি ঘিরে! রাতে খেতে বসে পিসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে স্পষ্ট করে। ভাবল প্রশান্ত, চিঠি পোড়ান থেকে সুরু করে, এই অদ্ভুত লোকটার কথা পর্যন্ত। পিসী কিছু না বললে, জিজ্ঞাসা করতে হবে জেঠুকে। জেঠু নিশ্চয়ই সব জানেন।

ইচ্ছা করেই ক্ষিদে নেই বলে জেঠুর সঙ্গে খেতে বসল না প্রশান্ত। তিনি খেয়ে উঠে গেলেই ওর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ খিদে পেয়ে গেল। পিসীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'পিসী, সেদিন রাতে উঠোনে তোমরা কি পোড়াচ্ছিলে ?

পিসী চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কি জানি, কি সব আজে বাজে অকেজো লেখা আর চিঠিপত্রের গাদা ছিল তোর জেঠুর। জোর করে সেগুলোই পোড়ানো হল।'

'আচ্ছা পিসী,...ইলা মাঝি কে ?

একথা শুনে কেমন যেন তাকালেন পিসী। সে মাত্র ক'সেকেণ্ডের জন্য। তারপর বেশ্ রাগ করেই বললেন, 'ও নামে আমি কাউকেই চিনি না। তবে টুইলা মাঝি বলে এক কুলির সর্দার ছিল, তোর পিসে সেখানে খাদানে কাজ করতেন। লোকটা ছিল বদের ধারী। তবে শুনেছি, সে বুড়োর এখন অবস্থা ফিরে গেছে। সে আর খাদানে কাজ করে না।'

'আচ্ছা, তাহলে প্রণত, প্রতাপটা কে ?

প্রণত, প্রতাপ কারও নাম হতে পারে না।

'আহা, ওই প্রতাপ নামে কেউ জেঠুকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করছেন, কে এই প্রতাপ।'

পিসী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'রাত অনেক হল শন্তু। সারাদিন খেটে খুটে, এখন আর আমি তোর সঙ্গে আজে বাজে কথা নিয়ে বকবক করতে পারি না। প্রতাপ, প্রলয়, প্রসূন, প্রসাদ, এমন তো কতশত নাম আছে পৃথিবীতে, তাদের সবার নাড়ি নক্ষত্র আমি জানব কেমন করে শুনি ?'

'আর ওই যে লোকটা জেঠুর সঙ্গে কথা বলছিল, ও তবে কে ?'

'জ্বালাসনি তুই।' বেশ রাগ করেই পিসী বললেন, 'তোর জেঠুর কাছে তো রাজ্যের লোক আসে ধান্ধায়। তাদের কাকেই বা আমি চিনি। তাহলে আমি কি করে বলব লোকটা কে ?'

বেশ বুঝতে পারল প্রশান্ত, পিসী অনেক কথা জানেন। কিন্তু সে সব কথা তিনি বলবেন না। আর পিসী যখন জানেন, তখনও জেঠুও জানেন। পিসী যখন কিছু বলছেন না, তখন কি আর জেঠু বলবেন! তার মানে দুজনেই কি যেন সব কথা ওর কাছ থেকে লুকোচ্ছেন। ব্যাপারটা যে কি হতে পারে কিছুই ভেবে পেল না প্রশান্ত।

এরপর কদিন এসব কথা নিয়ে ও খুব ভাবল। লোকটাকে কিন্তু আর কখনও রাস্তায় দেখতে পেল না। আর তা পেল না বলেই, আস্তে আস্তে, সব কথা ও ভুলে যেতে লাগল।

একদিন বিকালে খেলা সেরে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে বুকনা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। অবাক হল প্রশান্ত বুকনার কাণ্ড দেখে। কিন্তু বুকনা বেশ গম্ভীর। কাছে যেতেই বলল, 'চল তো আরও একটু আগে,' বলে কোন কথা আর না বলে সোজা হাঁটা দিল ঘুঘু ডাঙ্গার মাঠের দিকে। মাঠের মাঝখানে তেঠেঙ্গা বটগাছটার কাছে পৌঁছে বলল, 'ঠিক এইখানে আসবে, রাত আটটায়। এই নাও তোমার জরুরী পত্তোর আছে। আর খবরদার যদি একথা কাউকে বল তো তারা তোমার মুণ্ডু নামিয়ে দেবে বলেছে।' (ক্রমশঃ)

মজার খবর

বরুণ মজুমদার

কুকুরের বীরত্ব

বাড়ীতে অপরিচিত লোক ঢুকতে গেলে সাধারণতঃ পোষা কুকুর তাকে দেখে তাড়া করে, ঘেঁউ ঘেঁউ করে ডাকে। কিন্তু এমন কুকুর আছে যে অপরিচিত মেয়েদের দেখলেই সোজা বাড়ীর ভেতরে রান্নাঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকে! তার যত বিক্রম ছেলেদের দেখলে। হ্যাঁ কলকাতার তালতলা অঞ্চলে জনৈক শ্রীদাশগুপ্তের বাড়ীতে এমনি একটা স্পেনিয়াল ডগের সন্ধান পাওয়া গেছে। জানি না কোনো মেয়ে চোর রাত্রে ঐ বাড়ীতে ঢুকলে কুকুরটা চোরকে তাড়াতে পারবে কিনা!

কাগজ পড়া কম্পিউটার

কেউ লেখাপড়া না জানলে বা পড়তে জানা অন্ধ লোকেদের অনেক সময় আমরা অন্যকে কাগজ পড়ে শোনাতে দেখেছি। বাড়ীতে বুড়ো দাদু ও দিদিমাকে তোমরা খবরের কাগজটা অনেক সময় পড়ে শোনাও। কিন্তু একটা যন্ত্র কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে, এমন ঘটনা সত্যিই কি আশ্চর্য বলতো। এমনি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে জাপানে। সেখানে নিপ্পন টেলিগ্রাফ এ্যাণ্ড টেলিফোন পাবলিক কর্পোরেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান এমন কম্পিউটার যন্ত্র তৈরী করেছে যেটা কিনা একটা খবরের কাগজ খুব সহজেই পড়ে শোনাতে পারে। আর তার আওয়াজটা মেয়েদের কন্ঠস্বরের মতো। কম্পিউটারটা না দেখে কেউ যদি অনা ঘর থেকে শোনে তবে তার মনে হবে কোনো মেয়ে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। তবে একটা অসুবিধা কম্পিউটারটা শুধুমাত্র জাপানী ছাড়া অন্য ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র পড়ে শোনাতে পারে না, অন্তত এখন সে-রকম ভাবেই কম্পিউটারটা তৈরী করা হয়েছে। জানি না খুব শীঘ্র অন্য কোনো ভাষায় বই বা খবরের কাগজ পড়ার জন্য এই ধরণের পাঠিকা কম্পিউটার তৈরী করা হবে কিনা! তাহলে এতে অন্ধদের বিরাট সুবিধা হবে। কেননা অনেক সময় অন্ধদের কাছে বই পড়ে শোনানোর জন্য লোকের দরকার হয়। পাঠিকা কম্পিউটার হলে তাদের আর অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

জাপানী জিমনাস্টিক্স

জাপানের ছেলেমেয়েদের জিমনাস্টিকদের খ্যাতি প্রায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে! তাদের জিম-নাস্টিক সুরে মাতানো জিমনাস্টিকস্। ছন্দের তালে তালে পা ফেলে শরীর বেঁকিয়ে তাঁরা এই জিমনাস্টিক দের কলাকৌশল দেখিয়ে থাকেন। অবশ্য এর জন্য তাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট সরঞ্জাম বলে কিছু নেই। টোকিও মহিলা কলেজের শরীর শিক্ষা বিভাগের ছাত্রীরা জাপানের মধ্যে সেরা জিমন্যাস্ট বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা প্রায় প্রতিদিনই এই খেলায় নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করছেন এবং তা শিখছে। আগামী বছরের লস্ এঞ্জেলসের অলিম্পিক গেমসের জন্য তারা অনেক আগে থেকেই নিজেদের তৈরী করার কাজে ব্যস্ত। তাদের জিমনাস্টিকদের আধুনিক কলাকৌশল যত দেখা যায় ততই আনন্দে মন ভরে যায়।

হাতীর ভালবাসা

হাতিরা কি শিশুদের ভালবাসে? শিশুরা কি সহজাতভাবে হাতিদের কাছে প্রিয়? উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের গভীর জঙ্গলে একটা দাঁতালো বুনো হাতির আচরণ বন্য-পশু বিশেষজ্ঞদের এইসব প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে।

সম্প্রতি ঐ জঙ্গলে সেই হাতিটা বন বিভাগের একজন অফিসারকে বাগে পেয়েছিল। সেই অফি-সারের সঙ্গে ছিল তার দুই বাচ্চা মেয়ে। বাবাকে হাতিটা শুঁড়ে করে ধরেছে দেখে বাচ্চা দুটো ককিয়ে কেঁদে ওঠে। বাচ্চা দুটোর কান্না শুনে সেই দাঁতালো বুনো হাতিটা অফিসারটিকে মেরে না ফেলে খুব ধীরে ধীরে তাকে শুঁড় থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে চলে গেল। কালিম্পংয়ের কাছে গরুবাথানের ভুইখোলা ফরেস্টে এই অভূতপূর্ব ঘটনাটা ঘটেছে।

গাছে মানুষের বাসা

গাছ শুধু পাখীদেরই রক্ষা করে না, মানুষকেও রক্ষা করে। আর্জেন্টিনায় ৭০ বছর বয়স্ক একজন জেলে এবং তার ৬০ বছর বয়স্কা পত্নী বন্যার হাত থেকে বাঁচতে কিভাবে প্রায় দু'মাস গাছে কাটিয়েছেন তার একটা কাহিনী জানা গেছে। স্থানীয় পারানা নদীতে বন্যা দেখা দেওয়ায় ঐ জেলে ও তাঁর পত্নী একটা গাছের ওপর কুড়ে ঘর বানিয়ে প্রায় দু'মাস তাতে কাটিয়েছেন। জেলের একটা নৌকা ছিল, তার সাহায্যে রোজ মাছ ধরে তাই খেয়ে তারা তাদের ক্ষিদে মিটিয়েছেন। ঐ দম্পতি জানিয়েছেন যে, আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় গত কয়েকদিন হল তারা শুকনো ডাঙ্গায় নেমে এসেছেন।

রেকর্ড মামলা

একটা মামলা কতদিন ধরে চলতে পারে ? হ্যাঁ, তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না যে, মহারাষ্ট্রের পুনেতে ৭৬১ বছর পরে একটা মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। মামলাটার নিষ্পত্তি হয় ১৯৬৬ সালের ২৮শে এপ্রিল। গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এই মামলাটাকে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম মামলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটা ধর্মীয় উৎসবে পৌর–হিত্য করার অধিকার সম্পর্কে ১২০৫ সালে মালোজী থোরাট নামে এক ভদ্রলোক মামলাটা দায়ের করে–ছিলেন। এরপর গত ১৯৬৬ সালে তার উত্তরপুরুষ বালাসাহেব পাতলোজী থোরাট তার নিজের অনুকুলে ঐ মামলার রায় পেয়েছেন।

গিনিস বুকে অবশ্য বিশ্বের দ্রুততম মামলা নিষ্পত্তির রেকর্ডও উল্লেখ করা আছে। ১৯৭৭ সালে পয়লা মার্চ ইংলণ্ডের স্কটল্যাণ্ডের একটা আদালতে ঐ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল মাত্র সাত সেকেণ্ডে। এডিনবার্গ বিমানবন্দরের একজন বিমান চালকের বিরুদ্ধে আনীত ঐ মামলায় শেরিফ কোর্টের বিচারক শুধু দুটি কথা উচ্চারণ করে রায় দিয়েছিলেন নট গিল্টি অর্থাৎ দোষী নয়।

নবজাতকের ঘ্রাণশক্তি

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, শিশু জন্মা–বার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির অধিকারী হয়। কলকাতায় বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের একজন বিজ্ঞানী এটা প্রমাণ করেছেন। তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন একশোটি সদ্য-জাত শিশুর ওপর এর পরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি এক মিলিলিটার গোলমরিচের তেলকে একটু তুলোয় শুষে নিয়ে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে তা রেখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টেস্ট টিউবের মুখ বন্ধ করে সেটা ঘুমন্ত সদ্যজাত শিশুর নাকের কাছে নিয়ে গেছেন। তারপর বুড়ো আঙ্গুল সরিয়ে নিয়েছেন টেস্ট টিউবের মুখের ওপর থেকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ২৫ সেকেণ্ডের মধ্যে শিশুরা সেই গন্ধে সাড়া দিয়েছে। তাদের ঘুম ভেঙে গেছে।

পৃথিবীর তাপ

একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী বলেছেন যে, দু'হাজার খৃষ্টাব্দে পৃথিবী বর্তমানের চেয়ে এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশী গরম হবে। মিঃ জিওরী গলিস্টিন নামে ঐ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, বায়ু-মণ্ডলে কার্বন–ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই এটা হবে। তিনি বলেছেন, গত পঁচিশ বছরে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় দশ শতাংশ বেড়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়বে কিছু কিছু অঞ্চলে, তবে তাতে হিম-বাহ গলবে না। তার মতে এটা কৃষির পক্ষে সহায়ক হবে।

নতুন তথ্য

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সুদূর ছায়াপথগুলির মধ্যে হাই-ড্রোজেন গ্যাসের বিরাট বিরাট মেঘ আবিষ্কার করেছেন। সেখানে কালো কালো গর্তের মত কিছু অদৃশ্য বস্তু আছে যা মেঘগুলোকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে, এই আবিস্কার মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নতুন তথ্য উদ্ভাবনে ভবিষ্যতে সাহায্য করবে। এই প্রথম ছায়াপথগুলির মধ্যবর্তী স্থানে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেল। যদিও দু'দশক ধরে আমাদের জানা ছিল ছায়াপথগুলির অভ্যন্তরে তারকামণ্ডলীর মধ্যে হাই–ড্রোজেন আছে।

মহাশিল্পী-যামিনী রায়

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী ১৮৮৭ ('৮৮ ?) সালের ১০ই এপ্রিল, পল্লী-মায়ের কোল আলো করে জন্ম নিলো এক শিশু। প্রকৃতি দেবীও সেদিন অপরূপা সাজে সেজেছেন—নব জাতককে স্বাগত জানানোর জন্য।

যথা সময়ে নামকরণ হলো শিশুর। যামিনী! সবাই বললো, 'আশ্চর্য! এমন ফুলে ফুলে ভর ভরন্ত ঋতুর রাজা ফাগুন মাসে যার জন্ম—তার নাম যামিনী হবে কেন? যামিনী তো দেবতার নাম নয়, কোন ফুলেরও নাম নয়। যামিনী মানে তো রাত্রি! তাহলে?'

পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা শুনে যামিনীর মা শুধু মৃদু হেসে ছিলেন সেদিন। কোন প্রত্যুত্তর দেন নি। আসলে ওই এক চিলতে হাসিই ছিল তাঁর প্রত্যুত্তর। যেন ওই এক ফালি হাসির মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—তোমরা অবুঝ হচ্ছো কেন? নীলাম্বুধি রাত্রিই যে সূর্যের শ্রেষ্ঠ উপাসক। দ্যাখো, রাত্রি যার অন্য নাম যামিনী—তারই তো বুক চিরে জ্যোতির্ময় সূর্য ওঠে একদিন।

সেদিন যামিনী-জননীর এ মর্মবাণী কেউ না বুঝলেও বুঝেছিলেন একজন। তিনি যামিনীর পিতা—রামতারণ রায়।

একটু একটু করে বড়ো হতে থাকেন যামিনী। পাঠশালার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, শুভঙ্করী আর কড়া গণ্ডা বুড়ি পণ শেষ হয়ে যায় একদিন। পিতা রামতারণ যামিনীকে ভর্তি করে দেন স্থানীয় জুনিয়র স্কুলে। কিন্তু পড়ায় মন বসে না কিশোর যামিনীর। বাঙলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল বইগুলোর চেয়ে একতাল কাদা মাটি নিয়েই খেলতে ভালোবাসে সে। মাটি দিয়ে গড়ে শিবের ষাঁড়, লক্ষ্মীর প্যাঁচা, গণেশের ইঁদুর, ভাদু, ইতু, মা-লক্ষ্মী আরো কতো কি।

এমনও হয়, দেখা যায় স্কুলে যাওয়ার সময় যামিনী বাড়ি নেই। খোঁজ খোঁজ। অনেক খোঁজা খুঁজির পর যামিনীকে পাওয়া যায়—গ্রামের দীঘির পাড়ে, এক অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়। স্কুল যাওয়ার বদলে দীঘির কাদামাটি দিয়ে যামিনী তখন গাজনের শিব গড়ছে। পিতা রামতারণ ভাবেন, এ ছেলের বুঝি কিছুই হলো না। বিধাতা অলক্ষ্যে হাসেন!

আরও একদিন—

যামিনীর বয়স তখন সবে চোদ্দ বছর। কিশোর যামিনী পায়ে পায়ে এসে দাড়ালেন স্কুলের হেড-পণ্ডিত মশাই'র সামনে।

'পণ্ডিত মশাই—'

'কিছু বলবে যামিনী?'

'পণ্ডিত মশাই, বলছিলাম কি, এবছর সরস্বতী প্রতিমার বায়না দেবেন না। ও প্রতিমা আমিই গড়ে দেবো।'

পণ্ডিত মশাই বালকের কথা শুনে মৃদু হাসেন। উপযুক্ত সময়ে প্রতিমার জন্য বায়নাও দিয়ে দেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, পুজোর একদিন আগেই যামিনীর ঠাকুর এসে হাজির। শ্বেত-পদ্মে উপবিষ্টা শুক্লবসনা দেবী প্রতিমা দেখে সবাই অবাক। এ যে অবিকল মা-সরস্বতী! হেড পণ্ডিত মশাই তো বালকের কাণ্ড দেখে হতবাক। তিনি সেদিন যামিনীর মাথায় হাত রেখে শুধু অস্ফুট সুরে বললেন, 'জয়স্তু।'

যামিনীর হাতের কাজ দেখে সবাই গুণগানে পঞ্চ-মুখ। কেউ বলে, 'যামিনী দাদা, আমার রুমালে খাও পাখি গাও গান লিখে দাও না!' পাড়ার ঠাকুমা দিদিমারা বলেন, 'যামিনী, লক্ষ্মী পূজার দিন আমাকে একটা 'পিতিমে' গড়ে দিস বাবা, তোকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করবো।'

অবশেষে ঠিক হয়, যামিনী কলকাতায় যাবে, ছবি আঁকা শিখতে।

১৯০৩ সালে ক্যালকাটা আর্ট স্কুলে (বর্তমানে কলেজ) ভর্তি হলেন যামিনী। বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর। আর্ট স্কুলের শিক্ষক গির্লাডী সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কন পদ্ধতি ও তেল রং-এ

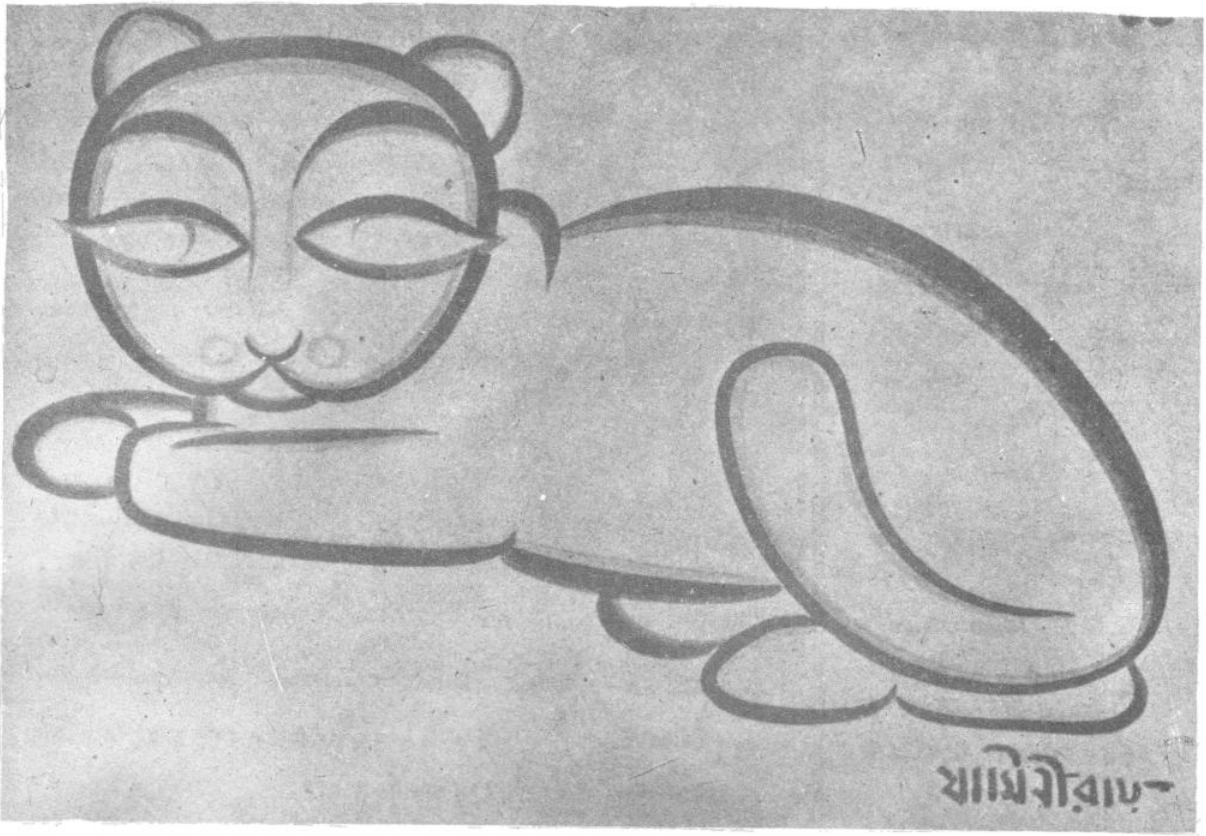

আঁকার কাজ যামিনী শিখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে গ্রামের মতো আর্ট স্কুলেও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর এলো শিল্পী যামিনী রায়ের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। বয়স তখন ৩৪ বৎসর। এতো দিনের তিল তিল করে শেখা পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকা ত্যাগ করে তিনি এসে দাঁড়ালেন, বাঙলার লোক জীবনের মুখোমুখি। এরপর তাঁর অনুপম তুলিতে মূর্ত হয়ে উঠলো, বাঙলার অবহেলিত তাঁতী, কুমোর, কামারদের ছবি। আঁকলেন সন্তান কোলে বঙ্গমাতা, সাঁওতাল কন্যা, রাধা কৃষ্ণের ছবি আরও কত কি। আর এই ছবিই একদিন ছড়িয়ে দিলো—বাঙলার সুপ্রাচীন লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য, আর সেই সঙ্গে শিল্পী যামিনী রায়ের সুনাম।

এরপর—

১৯৩৪ সালে সর্ব ভারতীয় ছবি প্রদর্শনীতে তৎকালীন ভাইস রয় কর্তৃক স্বর্ণপদক পেলেন যামিনী রায়।

১৯৫৫ সালে পেলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মভূষণ'!

এরপর দেশ দেশান্তর থেকে আসতে লাগলো বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ। কিন্তু দেশের মাটির মায়া এক দণ্ডের জন্যও ভুলতে পারেন নি যামিনী রায়। কোথাও যাওয়া হয়নি। কিন্তু পরপারের ডাককে এড়াতে পারলেন না তিনি। সেই দুঃখের দিনটি ১৯৭২ সালের ২৪শে এপ্রিল। বসন্তে এসেছিলেন, বসন্তেই চলে গেলেন।

ম্যাজিকের মজা

যাদু সম্রাট-এ. সি. সরকার

টি-পটের ভেলকি

স্থান কাল পাত্র ভেদে পৃথিবীর নানা দেশে নানা অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে আমাকে ম্যাজিক দেখাতে হয়েছে। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই আমাকে সুরু করতে হয়েছে ম্যাজিকের খেলা। তার পর কাজ চালাতে চালাতে মাথায় খেলে গেছে যাদু-কৌশল আর সেই কৌশলের কেরামতিতেই বাজি মাৎ করেছি। আজ তোমাদের কাছে এমন এক ঘটনার কথা বলছি। ঠিক সময়ে আমার মাথায় যাদু-বুদ্ধি না খেললে আমাকে হতবুদ্ধি হয়ে আমাকে বিশেষ নাকাল ও অপ্রস্তুত হতে হত।

সেবার ইউরোপ ভ্রমণ করার সময়ে ফরাসী দেশের রুয়াঁ (Rouen) শহরে এক বিশিষ্ট সংবাদ-পত্রের সম্পাদক আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন চা খাবার জন্য। জানতাম তাঁর বাড়িতে গেলে এক আধটা ম্যাজিক না দেখালে পার পাব না। তাই হোটেল থেকে বেরোবার আগে দু-তিনটে ছোট ম্যাজিকের যন্ত্র গুছিয়ে নিয়েছিলাম একটা ছোট ব্যাগে। কিন্তু কপাল দোষে, গাড়িতে চাপার সময় ঐ ব্যাগটা নিতে ভুলে গেলাম সঙ্গে।

চা পান পর্ব শেষ হতেই সম্পাদক মশাইর স্ত্রীর কাছ থেকে আবদার এলো ম্যাজিক দেখানোর। পড়লাম বড় মুশকিলে কী করি, কী করি ভাবছি। এমন সময় আমার নজর পড়লো টেবিলের উপরে পড়ে থাকা কেকের খালি প্লেটটার উপরে। মাথায় খেললো এক যাদু বুদ্ধি। খালি প্লেটখানা বাঁ হাত দিয়ে খাড়া করে ধরে রেখে আমি পিছিয়ে গেলাম পেছনের দেওয়ালের খুব কাছে। প্লেটের সামনা দিকটা থাকলো তাঁদের মুখোমুখি। এই অবস্থায় আমি টেবিল থেকে ডান হাত দিয়ে তুলে নিলাম টি-পট খানা। তারপর খাড়া প্লেটটার উপর দিককার কানার উপরে টি-পট-টাকে সাবধানে আলতোভাবে বসিয়ে ডান হাতে তা ধরে থাকলাম। এক অপলক নিবিষ্ট দৃষ্টিতে টি-পটটা নিরীক্ষণ করতে করতে বাংলা ভাষায় মন্ত্র পড়লাম :—

আষাঢ় মাসে চাষার ছেলে ধরতে গেল ব্যাঙ,
ব্যাঙ বাবাজি অক্কা পেলেন ভাঙ্‌লো চাষার ঠ্যাং !

তার পর যাদুকী চালে আমার ডান হাত তুলে নিলাম টি-পট থেকে। খাড়া প্লেটের সরু কানার উপর সার্কাসের নিপুণ খেলোয়াড়ের মতন অচল, অটল, অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো ভারী টি-পট খানা। কাণ্ড দেখে অবাক হলেন সম্পাদক মশাই, তাঁর স্ত্রী আর পরিবারের লোকজন।

কেমন করে এই অসম্ভব ব্যাপারটা সম্ভব হল তাই এবার বলি, শোন :—

আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা ছিল প্লেটের পেছনে দর্শকদের নজরের বাইরে। এই বুড়ো আঙ্গুলটাকে প্লেটের পেছনে উঁচিয়ে ধরে দর্শকদের অজান্তে আমি ঠেকনা দিয়েছিলাম টি-পটের তলায়। টি-পটের তলার এক ধারে ছিল প্লেটের কানার ঠেকনা আর বাকি আলগা ধারটাতে এই গোপন বুড়ো আঙ্গুলের ঠেকনা পেয়ে টি-পট পড়ে যাবার সুযোগ পায় নি। আমার পেছনে ছিল ঘরের দেওয়াল তাই সেদিক থেকে কারো দৃষ্টি এসে আমার গোপন রহস্য ধরতে পারে নি। আর তাই আমি করতে পেরেছিলাম বাজীমাৎ।

ভাল ভাবে অভ্যাস করে তারপর দেখ, তোমরাও সবাইকে অবাক করতে পারবে এ ম্যাজিক দেখিয়ে।

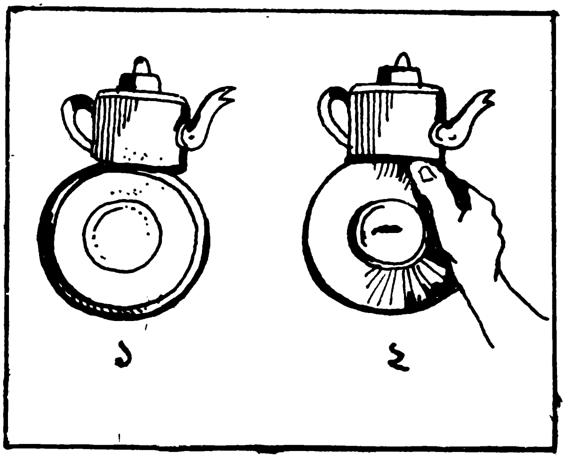

শব্দের ভাবনায়

পাশাপাশি—১, রামায়ণে যাদের নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড। ৪, সুগন্ধী মশলা। ৬, পর্তুগীজ জাতীয়। ৭, শরীর। ৮. মিথ্যে। ১০,———পেয়ারা তুমি খাও?

উপর নীচে—১) বিখ্যাত বাঙালী সুরকার। ২) শিক্ষার প্রধান বস্তু। ৩) সমগ্র রচনা। ৫) কাব্যে ধারা। ৬) বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ৯) মন্দির।

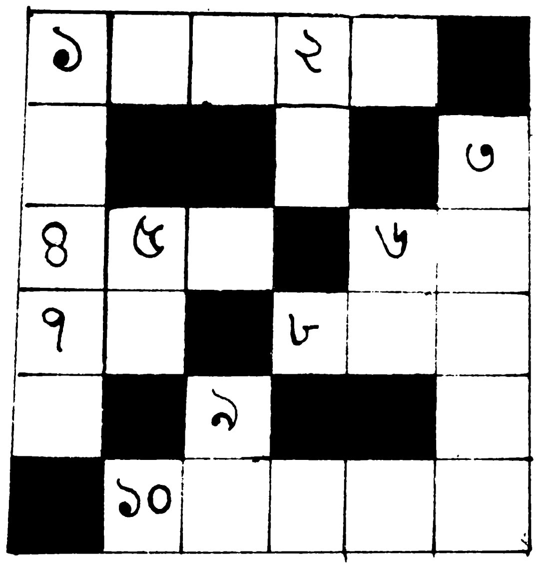

গত সংখ্যার উত্তর ঃ—

পাশাপাশি—১) বাবর, ৩) অশোক, ৬) মই, ৮) নখ, ৯) খেজুর, ১১) যম, ১২) বাদী, ১৪) টোপর, ১৭) সুচ, ১৯) ভীত, ২০) নরক, ২১) কামনা।

উপর নীচে—১) বামন, ২) বই, ৪) কোণ, ৫) কথক, ৭) জুজু, ৯) খেমটা, ১০) রবার, ১৩) প্রসুন ১৫) পোত, ১৬) চতুনা, ১৮) চর, ১৯) ভীম।

০ এবার থেকে শব্দের ভাবনার ছক যে কোন পাঠক পাঠাতে পারে। তবে নির্ভুল সমাধান সহ পাঠাবে।

অনুরোধ

আমার একটা অনুরোধ আছে। যেসব ছোটরা বিভিন্ন প্রতিভায় উঠছে, তাদের পারদর্শীতার খবর ছবিসহ পরিচিতি প্রকাশের একটা বিভাগ খুলুন। সেই সঙ্গে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনের সমালোচনার আলাদা একটা বিভাগ খুলে নতুনত্ব আনতে পারেন।

সুকুমার রায়, কোলাঘাট।

সুকুমার বাবু, আপনার পরামর্শগুলো মন্দ নয়। প্রতিভার খবর প্রকাশের সঙ্গে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেওয়ারও পক্ষপাতী ছোটদের আসর। আগামী দিনে নতুন প্রতিভাদের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করব। তবে পত্র পত্রিকার সংবাদ-পরিবেশনের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

কেন এত ভালো লাগে

আমি সুদুর নাগপুরে বাঙালী প্রবাসী। কিন্তু "ছোটদের আসরের" নিয়মিত পাঠক। কেন এত ভাল লাগে ছোটদের আসর তা লিখে বোঝাতে পারব না। বিশেষ করে নিয়মিত বিভাগগুলো। অমিতাভ চৌধুরীর "আজব কথা আজব ভাবনা" সত্যি আমার দারুণ লাগে। শ্রদ্ধেয় অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে কি ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে পারব? নারায়ণ বাবুর খাঁদু আর কেমিকেল দাদুর জন্য একমাস অপেক্ষা করা যেন সারাদিন উপবাসের পর ভাত মুখে দেবার মত। আপনি কি বলেন?

দয়াময় দত্ত
সেক্টর নং—২৮
এইচ. পি. নগর, নাগপুর।

ছোটদের আসর শুধু ছোটদের জন্য নয়। ছোট-বড় সবাকার ভাল লাগাই তো আমাদের স্বীকৃতি পাওয়া। আপনার চিঠি পড়ে সত্যি আমাদের অনু-প্রেরণা জাগছে।

পাক্ষিক হয় না?

ছোটদের আসরের জন্য একমাস অপেক্ষা করতে হয়। বড্ড দেরী মনে হয়। ১৫ দিনে প্রকাশ করা যায় না?

সুমিত নাগ
নিমতা, কলিকাতা-৪৯

এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয় ভাই। তবে ভবিষ্যতে তোমাদের আশা পূরণ করার চেষ্টা করব।

○ ছোটদের আসর মোটেই খারাপ নয়।

ছোটদের আসর ভাল নয় বলে চিঠিপত্রের আসরে যে চিঠি প্রকাশ হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলছি বর্তমানের ছোটদের আসর সত্যি দারুণ। নারায়ণ দেবনাথের ছবির তুলনা হয় না। আমি এই পত্রিকার জন্ম থেকেই পাঠক। অমিতাভ চৌধুরী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখার কি তুলনা হতে পারে? গল্প-গুলোও দারুণ, ছড়ার পাতাগুলো কি ভোলা যায়?

সবিমল গণ
দক্ষিণ বরাসত, জয়নগর।

* এই রকম চিঠি আরও দিয়েছেন—বর্ধমান থেকে—সুভাশীস, দেবাশীষ। হাজারিবাগ থেকে—অমলেন্দু বিকাশ রায়। মালদহ থেকে—জনার্দন বিশ্বাস। কাঁচড়াপাড়া থেকে—শ্যামল, দুলাল কুণ্ডু। অশোকনগর থেকে — চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

সুরজিৎ মজুমদারের খেল ছড়া

(১)

বার মাসে তের পার্বণ
আর কোথায় আছে ভাই
খেলা নিয়ে মাতছি সব
সুখেলোয়াড় কোথায় পাই ?
ফুটবলটা খেলি ভাল
ভাল খেলে হারছি তাই
ক্রিকেট মাঠে অনেক দিন
ভাল কোন খবর নাই !

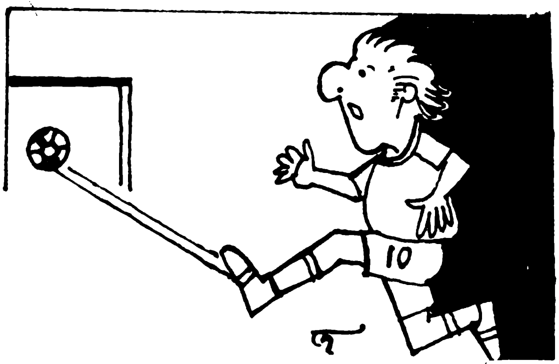

(২)

দল বদলের পালে হাওয়া
কেন এবার লাগছে না ?
খেলোয়াড়ের লুকোচুরি
হয়তো তেমন জমছে না ।

(৩)

ব্রহ্মা না ভাস্কর—
বল দেখি সেরা কে ?
এক দুই নম্বর
কাকে ঠিক মানাবে ?

(৪)

হকি নিয়ে হাঁকাহাকি
এখনও যে চলছে
বিশ্বের সেরা দল
সবাই কি বলছে ?
ধ্যানচাঁদ যাদুকর
যাদু কি জানতো ?
মনে প্রাণে খেলে জিত্
ঠিক তুলে আন তো ?

অর্জুন সোমের খেল ছড়া

(১)

এই বাংলার একটি ছেলে
দিলীপ যাহার নাম
টেস্ট ক্রিকেটের তাঁবু থেকে
মিল্ল ছুটী তার।

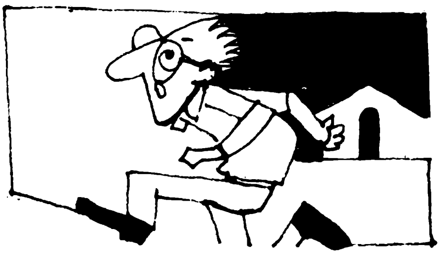

(২)

তোমরা যারা ভাবছ হবে
চন্দ্র, বেদী, সুনীল
খাটুনি খেটে জবর তবে
আজকে সেরা কপিল।

(৩)

কিংবা যদি হবে ভাব
টম্‌সন্ বা লিলি
এক্ষুনি যাও খেলতে মাঠে
ক্রিকেট না, ডাঙ্গুলি।

প্রতিভা প্রতিযোগিতা

ছোটদের আসরের পরিচালনায় ছোট গল্প (কিশোর মনের উপযোগী) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন লেখক-লেখিকা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। গ্রাহক না হলেও চলবে। ৮ থেকে ১৮ বয়স হলেও যোগ দিতে পারবে।

শব্দ সংখ্যা ১,৫০০। গল্পের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় থাকছে না। যেমন খুশী বিষয় অবলম্বনে গল্প লিখলে গ্রহণ করা হবে।

আকর্ষণীয় পুরস্কার!

! ! ! ! ! ! !

প্রথম দশটি রচনার জন্য দেয়া হবে প্রশংসাপত্র। এক থেকে পঞ্চম স্থানাধিকারী গল্পগুলি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে দশম স্থানাধিকারী গল্পগুলি "ছোটদের আসরের" পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করা হবে। এছাড়া বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হবে।

গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ

৩১শে জুলাই

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

১। ১ বৎসরের গ্রাহক চাঁদা ২৪·০০ টাকা। ৬ মাসের জন্য গ্রাহক হতে হলে দিতে হবে ১২·০০ টাকা। ৬ মাসের কম গ্রাহক করা হয়না।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২·০০ টাকা। গ্রাহকরা সেই দামেই বই পাবে। তাকে ডাকে পাঠানোর জন্য কোনো অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হয় না।

৩। গ্রাহক হতে হলে পুরো টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

৪। গ্রাহক চাঁদা এম-ও অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে Print and Publication Sales Concern-এর নামে পাঠাবে।

এজেণ্ট হবার নিয়মাবলী

১। প্রতি এজেন্টকে কম করেও ৫টি কপি বই নিতে হবে।

২। প্রতি কপির ডিপোজিট মূল্য ২·০০ টাকা জমা রাখতে হবে।

৩। ১০—২৫০ কপির জন্য—২৫% কমিশন দেওয়া হয়।

২৫০—১০০০ কপির জন্য – ৩০%

১০০০ এর ওপর বই নিলে—৩৩$\frac{১}{৩}$%

৪। টাকা এম-ও অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে "Print and Publication Sales Concern এর নামে পাঠাতে হবে।

প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখে ছোটদের আসর প্রকাশিত হয়।

Regd. No. 34364 CHHOTODER ASAR MARCH-APRIL '83 Price Rs. 2·00 only

Our Publications

Maps & Books for Tourist Interest

ROAD MAP OF INDIA in 4 sections
packed in plastic cover, each Rs. 12·00
MAP OF CALCUTTA in 43 sections 15·00
MAP OF CALCUTTA & HOWRAH
in plastic jacket Rs 12·00
MAP OF : India, West Bengal, Bihar, Patna,
Salt Lake City, Calcutta & Howrah
each Rs. 3·00
RAILWAY MAP OF INDIA Rs. 5·00
A HAND BOOK OF INDIA—
5 volumes (Each Book 15/-) Rs. 75·00
2 volumes „ „ „ Rs. 50·00
MOTORISTS' INDIA GUIDE Rs. 20·00
CALCUTTA HOWRAH GUIDE
WITH MAP Rs. 12·00
GUIDE TO DARJEELING, KALIMPONG
& SIKKIM Rs. 5·00
GUIDE TO DELHI & NEW DELHI
(with map) Rs. 12·00
CALCUTTA-HOWRAH GUIDE (with map)
(Pocket Edn.) in 3 languages, each Rs. 3·00
DISTRICT MAP OF WEST BENGAL
(in Bengali) Each Map Rs. 3·00

- 24 PARGANAS
- NADIA
- BIRBHUM
- MIDNAPUR
- BURDWAN
- HOWRAH
- HOOGHLY
- MURSHIDABAD

All sorts of Political & Physical Maps, Charts & Globs are spplied on order in both English, Bengali & Hindi Language.

PRINT & PUBLICATION SALES CONCERN
66, College Street, Calcutta-73. Ph. : 34-4367